মহাগুরু ও মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিনের মতাদর্শ

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদঃ

মহাগুরু রমিজ অধ্যাত্মবাদ (আত্মা বা পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল- এই দার্শনিক মত), কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

রমিজ প্রণীত তিনটি পুস্তক পর্যালোচনা করলে প্রথম পুস্তক (অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান) এর বাণী নং-১ হতে ১৮ পর্যন্ত মোট আঠারোটি বাণীতে তিনি সুস্পষ্টভাবে মানবের কর্ম ও কর্মফল এবং কর্মফল ও পুনর্জন্ম নিয়ে চমৎকার যুক্তিসঙ্গত কথা, তথ্য ও ভাব উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়াও তিনি "আত্মা বা পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল" এই দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার প্রতিফলনও উক্ত বাণীগুলোতে প্রতীয়মান হয়। এ আঠারোটি বাণীর মর্মার্থই মহাগুরু রমিজের অধ্যাত্ম মতবাদ ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভিক শুভ সূচনা করেছে। এগুলোকে মূল ভিত্তি করেই তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য জীবন-বিধান রচনা করেন।

মহামূল্যবান এ বিধান রচনা করতে গিয়ে তিনি আজীবন আত্মা, পরমাত্মা, কর্ম-কর্মফল, জন্ম-পূনর্জন্ম, জন্ম-জন্মান্তর, কর্ম-কর্মরোধ, কর্ম-জন্মরোধ, বেহেশ্‌ত-দোযখ, স্বর্গ ও স্বর্গে আরোহণ সম্পর্কে বহু উপদেশ ও বাণী রচনা করেছেন। তাছাড়াও তিনি আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি এবং মারফত বা মরমী সাধনা অর্থাৎ স্রষ্টাকে সম্যকভাবে জানার যে সাধনা তার সম্পর্কে বহুবিধ আদেশ, উপদেশ, সিদ্ধবাক্য বা আপ্তবাক্য ও বাণী রচনা করেছেন। মহাগুরু

রমিজের আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ ও সার্বজনীন সত্য (universaltruth) কথাগুলোই তার বিধান হিসাবে পরিগণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এ পুস্তকে প্রথমেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এখানে রমিজ বিধানের মূল ভিত্তি আঠারোটি বাণী ও ইহাদের মর্মার্থ নিম্নে বর্ণিত হলো,-

বাণী নং-০১ *"মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে*
আসা যাওয়া তোর হলনা বন্ধ
খেটে মরবি ভবের জেলে"।

১। আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি, কারে তুমি জানাও স্তুতি
কেহ নয় কারো সাথী, ভাল মন্দ সব কর্মফলে।
২। কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংড়া, কেউ খেতে পায়না,
কেউ করে আমীরানা, বিচার কর নিজের দিলে দিলে।
৩। তুমি বল আন্‌ছি ইচ্ছা করে, যা চেয়েছি দিয়েছে মোরে,
আমি বলি তা হয় কি করে, পিতায় কি কখন ফেলে জলে।
৪। যদি বল এইসব বিধির ইচ্ছা, তবে সাধন ভজন সবই মিছা,
সমান হবে রাজা প্রজা, বিচার হবে না কোন কালে।
৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এক কথার নাই আগা মাথা,
ঠিক করে নেও কর্ম খাতা মুক্তি পাবি ধরাতলে।

বাণীর মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা: এই বাণীর মূল বিষয়বস্তু হলো- মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা জীবের জন্ম ও পৃথিবীতে আসা এবং মৃত্যুর পর চলে যাওয়া নিয়ে। এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন দেখ্‌ছি।

আত্মার ভুলের জন্যই তার জন্ম নিয়ে পুনরায় ভবগুরূপ জেলখানায় আসতে হয়। এখানে পৃথিবীকে কর্মফল ভোগ করার জেলখানা হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। এ বিষয়টি দেখে শুনেও কেন ভুল করছে তা-ই বিবেক দ্বারা মনকে জিজ্ঞাসিত করা হয়েছে।

মহাগুরু রমিজের মতবাদ অনুযায়ী উক্ত বিষয়টি হচ্ছে, জীবনচক্র নামক (৮৪ লক্ষ যোনী চক্রাকারে ভ্রমন করা) পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে আসা যাওয়ার একটি বিশেষ কর্মগতি বা কর্মফল ভোগ করার একটি প্রক্রিয়া বিশেষ। অর্থাৎ, কর্ম ফেরে বা কর্মের ভালমন্দ বিবেচনায় পৃথিবীতে মানুষ পুনঃপুনঃ কর্মফল ভোগ করার নিমিত্তে জন্ম নিয়ে আসতে হয়। ইহার যুক্তি হিসেবে তিনি তাঁর বিবেককে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এ পৃথিবীতে কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংড়া, কেউ খেতে পায়না আবার কেউ আমীর হয়ে জন্ম নিয়ে সুখে আছেন, তার কারণ কি ?

যদি বলা হয় যে, তাঁহারা স্রষ্টার নিকট হতে যার যার অবস্থা চেয়ে এনেছেন। যদি তা-ই হয় তবে, বিষয়টি হলো এমন যে, স্রষ্টাতো সবাইর পিতা। পিতা হয়ে যেমন তাঁর সন্তানকে জলে ফেলতে পারেন না বা ফেলে দিবেন না, তদ্রুপ কোন লোক কানা, লেংড়া বয়রা ইত্যাদি ইচ্ছাকৃতভাবে হতে চাইলেও বিধি বা সৃষ্টির পিতা স্রষ্টা তা দিতে পারেন না। কারণ, স্রষ্টা বিশ্বপিতা হয়ে তাঁর সন্তানের অশুভ কামনা করতে পারেন না।

আবার যদি বলা হয় যে, ঐগুলো সবই বিধির ইচ্ছা তাও হতে পারেনা। কারণ, সৃষ্টির স্রষ্টা বা বিশ্বপিতা যদি যা ইচ্ছা তা করেন এবং মানবকে সৃষ্টির বলে ঘোষণা দিয়ে **(আশরাফুল মাখলুকাত)** সেই মানুষকেই ইচ্ছামত (স্রষ্টার ইচ্ছায়) কানা, বোবা, লেংড়া ইত্যাদি আজাবে নিপতিত করেন, তবেতো রাজা প্রজার কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সাধন ভজনেরও কোন দরকার হবে না। কারণ, স্রষ্টার ইচ্ছায়ই যদি সব হয় তবেতো তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেলেন এবং যা ইচ্ছা তাই করবেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্রষ্টাকে ডাকার কোন প্রয়োজন থাকছে না। তিনি নিজ ইচ্ছায়ই যদি সব করেন তবে তার সাধন ভজন প্রশংসা ইত্যাদি নিস্প্রয়োজন।

সর্বশেষে রমিজের বিবেক বলছেন "উপরোক্ত উক্তি সমূহ সবই শোনা কথা। ইহাদের কোন যুক্তি নেই"। রমিজের বিবেক আরও বলছেন ***"কর্ম অনুযায়ী ফল"। "কর্ম-ফল ভোগতেই হবে"।*** মানবের কর্মের জন্য মানব-ই দায়ী, স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা যার যার কর্ম অনুযায়ী কর্ম-ফল দিবেন। তিনি সূক্ষ্ম বিচারক যে যেমন কর্ম করবে ঠিক তেমনি কর্ম অনুযায়ী তার দেহ গঠন হবে।

নিজ স্বার্থের জন্য যদি কারো স্বভাব এমন হয় যেন, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/বস্তু চোঁখে দেখেও বলে যে "আমি দেখি নাই" এবং এ মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার জন্য ইহা যদি অন্য কারোর বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে সে চোখের অপব্যবহার করলো। বিচারে সে কানা হওয়া উচিৎ। সে পরজন্মে কানা হয়ে জন্ম নিলে তা যুক্তিসঙ্গত হবে।

এমনভাবে কেহ যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাত, পা, মুখ ইত্যাদির অপব্যবহার করতঃ অন্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে, তাহলে সে ঐ অঙ্গগুলো বিকৃত অবস্থায় নিয়েই পুনঃজন্ম নিবে। অসৎ কর্মের কারণেই পুনঃজন্ম হয়।

তাহলে যার যার শারিরীক ও মানসিক অবস্থা গঠনের জন্য নিজেই দায়ী। স্রষ্টা নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি সৃষ্টির পিতা।

কেহ ইচ্ছা করে বিকৃতি দেহ নিয়ে জন্ম নিবে- ইহা যেমন হতে পারেনা তেমনি সৃষ্টির পিতা ইচ্ছা করে তাঁর সন্তানকে বিকৃত দেহধারী করে সৃষ্টি করতে পারেন না। যার যার জন্ম এবং দেহের গঠন তার তার নিজ কর্মফলে হয়। অর্থাৎ, সবই আত্মকর্মের ফল।

উল্লেখিত বাণীটির শেষ পর্যায়ে গুরু রমিজ বলেন ***"ঠিক করে নেও কর্মখাতা, মুক্তি পাবি ধরা তলে"।*** এই মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি। মুক্তি পেতে হলে মহাগুরু রমিজের বিধান মতে আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে হবে। তার মানে নিস্কলুষ চরিত্র গঠন করতে হবে।

ধরাতে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হলে অথবা জন্ম-মৃত্যু রোধ করতে হলে অর্থাৎ জন্মচক্র হতে মুক্তি পেতে হলে মুক্তি লাভের সঠিক কর্ম তালাশ করতঃ উক্ত কর্মের মাধ্যমে আত্মার ভুল সংশোধন করতে হবে। আর তাহলেই জন্মরোধ হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

উক্ত কর্মখাতা বলতে একজন মানুষ জন্মের পর হতে বর্তমান পর্যন্ত যত কর্ম করেছে তার ভাল-মন্দের হিসাব নিকাশ বা হিসাব নিকাশের কর্ম তালিকাকে বুঝায়। যেহেতু রমিজ একজন আধ্যাত্মিক মহাগুরু, সেহেতু তার রচিত সকল বাণীর মূল বিষয়বস্তু হবে অধ্যাত্ম বিষয়ক। উক্ত কর্মখাতা অথবা কর্মের খতিয়নের সকল কর্মই জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও স্রষ্টা বিষয়ের অন্তরভুক্ত হবে। কর্মখাতা ঠিক করার মানে হলো মহাগুরুর প্রদর্শিত বিধান ও আদেশ মোতাবেক বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কর্ম সমাধা করা।

<u>বাণী নং-০২</u> *"আসা যাওয়া জীবে সর্বদায়,*
কর্ম ফেরে এই সংসারে
ঠেকিয়াছ বিষম দায়"।

১। চৌরাশি করিও লক্ষ্য, কর্ম সত্য দেখবে স্পষ্ট,
জীবের জীবন মহা কষ্ট, বন্দী সবে জেলখানায়।

২। সর্বজীবে বিরাজমান, দেখে নেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
শোনা কথায় না দিও কান, দেখ যার যে কর্ম খাতায়।

৩। কর্ম জীবের আসল তত্ত্ব, কর্ম বলে জীবন মুক্ত,
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, বিশ্বাস হবে না কার কথায়।

৪। রমিজ কয় কর কর্ম তালাশ, আসা যাওয়ার পাবি খালাস
জন্ম-মৃত্যু করবিরে পাশ, ভয় পাবিনা চিনা রাস্তায়।

বাণীর মর্মার্থ ও ব্যাখ্যাঃ

এখানে বাণীর প্রথমেই মহাগুরু রমিজ আত্মাসমূহকে রুহের দেশ আলমে আরওয়া হতে পৃথিবীতে আসা এবং মৃত্যুর পর পৃথিবী হতে রুহের দেশে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে বলছেন।

তিনি বলেন, কর্ম ফেরে বা কর্মের ভাল মন্দের বিবেচনায় মন্দ কর্মের কর্মফল অনুযায়ী আত্মা সমূহ পৃথিবীতে পুনঃজন্ম নিতে হচ্ছে। অসৎ কর্মের জন্যই মানব-আত্মা, পশু, পাখি ও বিভিন্ন প্রাণীরূপে (৮৪ লক্ষ প্রকার যোনীতে) চক্রাকারে ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতে হয়। ৮৪ লক্ষ যোনিতে ক্রমান্বয়ে ভ্রমন বা ৮৪ লক্ষ প্রকার জীবে ক্রমান্বয়ে জন্মধারণ করা হচ্ছে সর্বজীবের জেলখানা। এ জেলখানা হচ্ছে অতীব কষ্টের বন্দীখানা।

প্রত্যেক মানব আত্মাই পরম আত্মার জাত। কর্মফলে মানব আত্মা সমূহ সর্বজীব রূপে বিরাজিত। তাহলে সর্বজীবের আত্মা সমূহও পরম আত্মার জাত। আবার পরম আত্মাই স্রষ্টা। তাই, স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান।

অতঃপর বলা হচ্ছে *"কর্মই জীবের আসল তত্ত্ব"*। তার মানে জীবের জীবন ও মুক্তির মূল মতবাদ বা দর্শন হচ্ছে কর্ম ও কর্মফল। কর্ম ও কর্মফলের কারণে-ই আত্মা বার বার জন্ম নিতে হয়, অথবা ৮৪ লক্ষ প্রকার জীবের জন্ম-চক্র হতে মুক্তি লাভ করে থাকে। *"সৎ কর্ম বা ভাল কর্মের ভাল ফল ও মন্দ কর্মের মন্দ ফল" ইহাই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নীতি*।

কর্মের সাথে জন্ম, অজন্ম, জন্মরোধ, পুনঃজন্ম ইত্যাদি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

কর্মবাদ মতে নিস্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক মানবতাবাদের মানব-ধর্ম তথা, সকল মানবগোষ্ঠীকে, সর্বজীবকে ও সর্ব সৃষ্টিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এবং ভালবাসা ও প্রেমের মাধ্যমে সর্ব সৃষ্টিতে বা বিশ্ব প্রকৃতির সাথে লয় হতে পারলেই আত্মার মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

তাই, গুরু রমিজের বিবেক তাঁর পন্থীদেরকে সৎকর্ম তালাশ করার উপদেশ দিচ্ছেন। একজন সদ্‌গুরুই সৎকর্মের সন্ধান দিতে পারেন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করার আদেশ দিতে পারেন। সৎকর্মের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আসা যাওয়া বা জন্ম মৃত্যু রোধ করা যায়। এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নীতি যিনি বুঝতে পেরেছেন এবং হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁর জন্য এই পথ নির্দেশ অত্যন্ত সহজ এবং পরিচিত বা চিনা রাস্তা। কারণ, যিনি নিজকে নিজে চিন্‌তে পেরেছেন তিনিই সর্ব কর্ম, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং সর্ব কর্ম করার সুযোগ ও ক্ষমতা অর্জন করেছেন। আর এ ক্ষমতা যিনি অর্জন করেছেন তাঁর কর্ম বিষয়ে কোন ভয় ভীতি থাকার মূলতই কোন কারণ থাকতে পারেনা।

<u>বাণী-০৩</u> *"কেন লোকে দোষে মোরে*
তুমি পিতা কি মাতা জানি না বিধাতা
কি বলে ডাকিব তোরে"।

১। তুমি করাও আমি করি, সকল দোষ কেবল আমারই
দেখ তুমি চিন্তা করি, কেবা দোষী এই সংসারে।

২। তুমি আমি মাখা মাখি, দুইজনে এক ঘরে থাকি,
কাজে কাজে দিয়া ফাঁকি, সকল দোষ দেও আমার ঘাড়ে।

৩। রমিজের ঘরে দিয়া ঠাঁই, কাজের সময় খুঁজে না পাই
কেবল বল আমার দোষ নাই, কি করি পারিনা জোরে।

<u>বাণী মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা</u>: এ বাণীতে দেহস্থিত মন ও জ্ঞানের কর্ম ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া বর্ণনা দিতে মহাগুরু রমিজ তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন সম্মত অনুভূতির মাধ্যমে মন ও জ্ঞান সত্তা উভয়ের মধ্যে আত্মকর্মের বিষয়ে সংলাপ বা কথোপকথন তুলে ধরেছেন।

আবার স্রষ্টাকে বিধান কর্তা সম্বোধন করে তাঁকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, তিনি পিতা কি মাতা তা কিছুই জানা নেই এবং তাকে কি বলে ডাকতে হবে তাও জিজ্ঞাসিত করা হয়েছে।

তবে বাণীতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা পিতাই হোক আর মাতাই হোক, তিনি যে বিশ্ব প্রকৃতির বিধাতা বা বিধান দাতা অথবা বিধানকর্তা এর মধ্যে কোন ভুল নেই এবং কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ ইহাও বলছেন যে, মানুষের কর্মে যা কিছু ঘটছে তার জন্য সকলেই আমিত্ব (জ্ঞান) বা কর্মকারককে দায়ী করে থাকে।

আবার জ্ঞান (আমিত্ব) বা কর্মকারক মনকে বলছে যে, মনের পরিচালনায় মানবের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু কর্ম দোষের জন্য কর্মকারক বা আমিত্ব (জ্ঞান) কে-ই দায়ী করে থাকে।

ইন্দ্রিয় ও রিপু দ্বারা তাড়িত হয়ে মন সর্ব কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তাই জ্ঞান (কর্মকারক) মনকে বলছে "তুমি করাও আমি করি, সকল দোষ কেবল আমারই"। এখানে চিন্তা করে দোষী সনাক্ত করার জন্য সদ্‌জ্ঞান মানবের মনকে আহ্বান করছে। চিন্তা বা ধ্যান ছাড়া ভাল-মন্দ সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। আবার চিন্তা বা ধ্যান করতে হলে বিবেক নামক দেহস্থ আরেকটি সত্তার প্রসঙ্গ এসে যায়। মন, জ্ঞান ও বিবেক সকলই দেহের আত্মাস্থিত পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু মন রিপু ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিকৃত হয়ে সকল অপকর্মের কর্মী হয়ে আমিত্ব (জ্ঞান) বা কর্মকারককে দায়ী করে থাকে।

সবশেষে উল্লিখিত গুরু রমিজের বিবেক (বিচারক) বলছেন, *"আমার আমিত্বের ঘরে বা আমার দেহে মন ও জ্ঞান উভয়কেই স্থান দেয়া হলো, তার পরও আমার (বিবেকের) বিপদ সময়ে তাঁরা (মন ও জ্ঞান) উপযুক্ত বিধান সম্মত কর্মবান হয় না, তাঁরা তাদের ত্রুটি বা দোষ স্বীকার করে না।"*

এখানে দেহের ইন্দ্রিয় ও রিপু সমূহ মন দ্বারা পরিচালিত হয়ে জ্ঞান ও বিবেকের উপর প্রবল হয়ে উঠে। এ অবস্থায় জ্ঞান মনের উপর আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ জন্যেই রমিজ বলছেন "কি করি পারি না জোরে"। তাই সৎগুরুর সঙ্গ করতঃ মহাজ্ঞানী হতে পরম জ্ঞান (সৎজ্ঞান) অর্জন করে সৎগুরুর বিধানে চর্চা পূর্বক বিধান সম্মত কর্ম ও সাধন ভজন করতে হবে। তা হলেই মন, রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান বা আমিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

<u>বাণী নং-০৪</u> ***"আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে***
মন্দ করলে হয়রে মন্দ
ফল ভোগে তার অবশেষে"।

১। কেউ বলে শয়তানে করে, আমি করি কেন দোষে তারে
বুঝিনা বুঝাও মোরে দেখেনা যারে কেন দোষে।

২। কেউ বলে শয়তানে করায়, কেউ বলে কর স্বভাব দ্বারায়,
স্বভাব শয়তান দেখছ কোথায়, চোখ থুইয়া হারাইলা দিশে।

৩। না দেখিয়া মিথ্যা প্রমাণ, হাশরে কাটা যাবে জবান
পূর্ব কর্মের নাই পরিত্রাণ, পুনঃজন্ম অন্য বেশে।

৪। রমিজ কয় কর্মফল এইমাত্র আছে সম্বল
শয়তানে কি দোষী বল, পথ হারালি অবিশ্বাসে।

বিঃদ্রঃ *এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ কর্মবাদ নীতির কথাই স্মরণ করছেন। ইহার মূল কথাই হচ্ছে "<u>কর্ম অনুযায়ী ফল</u>"। তিনি (রমিজ) যুক্তির মাধ্যমে কর্মফল সত্য, কর্মফল অবশ্যম্ভাবী, ভাল কর্মের ভাল ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল এবং অদৃশ্য ও কাল্পনিক শয়তান বলতে কিছুই নেই। কাল্পনিক শয়তানের বিষয়টি হচ্ছে সম্পূর্ণ কু-সংস্কার (Superstion)।*

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা: একজন মহানজ্ঞানী ব্যক্তি কখনো নিজেকে জ্ঞানী বলেন না। তাই, রমিজ বাণীটির আরম্ভই করেছেন "আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে"। তিনি যে অগাত জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন এ কথা তারই পরিচয় বহন করে।

মানুষ মন্দ কর্মের মন্দ ফল ভোগতে হবে, এ বিষয়টি অবশ্য সত্য বলে তিনি যে অনুভব করেছেন তা তাঁর ভাষাতেই প্রতীয়মান হয়। তবে মানুষ কেন এ সহজ বিষয়টি বুঝেন না বা উপলব্ধি করেন না, তা তিনি বুঝতে গিয়ে অবাক হয়েছেন।

মানুষ মন্দ কর্ম করলে ইহার জন্য অনেকে শয়তান নামক এক অশরিরী কাল্পনিক সত্তাকে দায়ী করে। কেউ বলে উক্ত মন্দ কর্ম শয়তানে করে, আবার কেউ বলে শয়তানে করায়। এমনিভাবে কেউ বলে করে স্বভাব দ্বারায়।

কিন্তু লিখক (গুরু রমিজ) বলেছেন শয়তান ধরা ছোয়ার বাইরে ইহাকে দেখা যায় না বা তার অস্তিত্ব নাই, শয়তানে যারা বিশ্বাসী তারা কুসংস্কারে নিমজ্জিত।

আবার কেউ বলে মন্দ কর্ম শয়তানে করায়, কেউ বলে মানুষের স্বভাবই ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু স্বভাব শয়তানও একটি কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। তবে, মন্দ কর্মের বিষয় দেখতে হলে বা বুঝতে হলে অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষু যাদের আছে তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন। কেহ না দেখে কাল্পনিক শয়তানকে মন্দ কর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত করলে ইসলামী বিধান মতে হাশরের বিচারের দিন তাঁর জবান কাটা যাবে।

গুরু রমিজের মতে পূর্ব জন্মের কর্ম ফেরেই মানুষ অসৎ কর্ম বা মন্দ কর্ম করে। আর জন্মান্তর বাদের নীতি অনুসারে অশুভ বা অসৎ কর্ম করার নিমিত্তেই মানুষ পর জন্মে পশুতে জন্ম নিয়ে থাকে। সুতরাং, গুরু রমিজ বলছেন কেবলমাত্র নিজ নিজ কর্মফলই মৃত্যুর পর মানব আত্মার সাথে রুহের দেশে যাবে। কর্মফল অনুযায়ী তার ফল ভোগ করবে। অনাহুত শয়তানকে দোষী করা ঠিক নয়।

বাণী-০৫ *"বুঝালে বুঝনা কেনে*
চিন্তা কর চিন্তামনি
আগের কথা কর মনে"।

১। কোথায় ছিলে কোথায় এলে, কোথায় যাবে দিন ফুরালে,
আসা যাওয়া তোর কর্মফলে, শান্তি নাই তোর কোন খানে।

২। শোনা কথা করি বিশ্বাস, নিজের গলে নিজে দিতেছ ফাঁস,
চিন্তা কর সব হবে প্রকাশ, বিশ্বাস হয়না কেন দেখে শুনে।

৩। বেহেশ্‌ত দোযখ নিরাকারে, না দেখলে কে বিশ্বাস করে
রাজা মন্ত্রী আমীর এই সংসারে, সুখী তারা কি কারণে।

৪। বোবা লেংড়া ভিক্ষুক কানা, বল তারা কেন খেতে পায় না,
রমিজ কয় চেয়ে দেখনা, বেহেশ্‌ত দোযক এই ভূবনে।

বিঃদ্রঃ *এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ অধ্যাত্ম বা আত্মা, পরমাত্মা এবং স্রষ্টা বিষয়ে যারা গবেষণামূলক চিন্তা করেন (চিন্তামনি) তাদেরকে আত্মার পূর্বজন্মের কথা বা আগের কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। পূর্বজন্মের কি কর্মের ফলে মানবাত্মা অন্যরূপ (পশুরূপ) ধারণ করে পুনঃজন্ম লাভ করতঃ বিভিন্ন পরিবেশে বিচরণ করছে ইহাই এখানে মূল বিষয়বস্তু, আর বেহেস্ত দোযক সম্বন্ধেও এখানে কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে।*

ব্যাখ্যা: এ বাণীতে মানবদেহে বিরাজিত মন, জ্ঞান ও বিবেকের কথোপকথন আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব জন্মের কি কর্মের বলে এবার মানব জন্ম ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছে তাই জ্ঞান দ্বারা মনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। মানবাত্মার জ্ঞান দেহস্থিত বর্তমান মানবাত্মা কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, মৃত্যুর পর আবার কোথায় ফিরে যাবে, ইহাই রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন। কর্মফল অনুযায়ী পুনঃজন্ম নিয়ে চৌরাশি লক্ষ প্রকার প্রাণীতে জন্মচক্রে আসতে হয় এবং উক্ত চক্রের কোন স্তরেই কারো শান্তি নেই।

মানুষ সাধারণতঃ ধর্ম কর্মের ক্ষেত্রে সমাজের মৌলভী-মাওলানা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, প্রভু পদ-পাদ্রী ইত্যাদি লোকগণ যা বলেন তা বিচার বিবেচনা না করে হুজুকের উপর বা অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধর্ম কর্ম করে অভ্যস্ত। কিন্তু লেখক (গুরু রমিজ) এভাবে শুনা কথায় এবং অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ধর্ম-কর্ম করাকে আত্মঘাতী এবং নিজের গলে নিজে ফাঁসী দেয়ার সামিল বলে বিবেচনা করছেন। নিজের গলে নিজে চুপি চুপি ফাঁস দিলে যেমন কেহ দেখেনা এবং বাচাতে পারে না তেমনি উক্ত শুনা কথায় অন্ধ বিশ্বাস করতঃ ভুল করলে এ ভুলের আর কোন সমাধান থাকেনা। সকল কর্ম ও কর্মফল চিন্তা করলে ভাল মন্দের সত্য প্রকাশ অর্থাৎ কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তা অবশ্যই প্রতীয়মান হবে।

এ বাণীতে আরো বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে রাজা মন্ত্রী আমির, সবাই সুখ ভোগ করছেন।

আবার এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ বোবা, লেংড়া, ভিক্ষুক, কানা, খেতে পায় না, বহু কষ্টে দিনাতিপাত করছে, তাদের দুঃখের সীমা নেই। তবে, মানুষে মানুষে কেন এত ভেদাভেদ, কেন এত ব্যবধান। প্রত্যেকেই মানুষ এবং স্রষ্টার সৃষ্টি।

মহাগুরু রমিজ মানুষকে দিব্যচক্ষু এবং দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখা ও পর্যবেক্ষন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। দিব্যদৃষ্টিতে দেখলে ইহাই দেখতে পাবে যে, উক্ত দুই দলের মানুষের প্রথম দল এ পৃথিবীতেই বেহেস্তবাসী আর এক দল দোযকবাসী অর্থাৎ পৃথিবীতেই বেহেস্ত এবং দোযক রয়ে গেছে।

পূর্ব কর্মের কর্মফল অনুযায়ী যার যা প্রাপ্য তিনি তাই পাচ্ছেন। নিজের কর্মফলের ভাল মন্দের ফলাফল নিজেই ভোগ করছেন। এ নীতি কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

বাণী নং-০৬ *"ঠেকলি মন তুই ভবে এসে*
কেউ বলে সাকার কেউ বলে নিরাকার
বুঝিনা হারাইলাম দিশে।"

১। মুখ থাকিলে আছে জবান, সর্বজীবে দেখ প্রমাণ,
মুছার সঙ্গে হল কালাম, আকার নাই কেন বল মিছে।

২। জবান থাকলে আছে আকার, আকার থাকলে করে আহার,
অন্ধ লোকে কয় নিরাকার, চক্ষু নাই যার দেখবে কিসে।

৩। আকার নাই তাঁর আছে প্রাণ, আরো নাই তার পুত্র সন্তান,
বিশ্বাস করলে হবি বেঈমান, না খাইলে কেমনে বাঁচে।

৪। রমিজ কয় তাঁর আকার সত্য, তালাশ কর মিলবে তত্ত্ব,
পাবিরে তুই জীবন মুক্ত, আসা যাওয়া নিজের খোঁশে।

বিঃদ্রঃ এই বাণীতে স্রষ্টার আকার, সাকার, নিরাকার ও মানবের জীবন মুক্তি এবং স্রষ্টা সর্বত্র আকারময় অবস্থায় বিরাজ করছেন তাই বিবৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: এ পৃথিবীতে অনাদি অনন্তকাল হতেই স্রষ্টার আকার এবং নিরাকার নিয়ে বহু ধর্ম, বহু মত ও বহু পথ সৃষ্টি হয়েছে। কারো মতে স্রষ্টা সাকারে বিদ্যমান, কারো মতে তিনি নিরাকারে বিরাজিত এবং এ বিষয় নিয়ে বহু মানুষের বহুরূপ ধারণা।

তাই, স্রষ্টার বিদ্যমান তাঁর নানারূপ স্বরূপ নিয়ে মানবাত্মার জ্ঞান তাঁর মনকে তাঁর দিশেহারা ও ঠেকা অবস্থার কথা বলে প্রবোধ দিচ্ছেন। যাদের মুখ আছে তাদেরই জবান আছে। অর্থাৎ যাদের মুখ আছে তারাই কথা বলতে পারেন। কথা বলার জন্য মুখ থাকা একটি পূর্ব শর্ত। কথিত আছে যে, মুছা (আঃ) নবীর সাথে আল্লাহ্‌র দৈনন্দিন কথোপকথন হয়েছে। তাই যুক্তিমতে (Logically) আল্লাহ্‌র মুখ ও জবান আছে। অনুরূপ যুক্তিমতে তাঁর (আল্লাহ্‌র) জবান থাকলে এবং তিনি কথা বলতে পারলে নিশ্চিতভাবে তাঁর আকার আছে এবং সর্বজীবের ন্যায় তিনি আহারও করে থাকেন। তাহলে, মিছা মিছি আল্লাহর আকার নেই তা বলা অনুচিত। তাহলে, যারা

অন্ধ যাদের অন্তরচক্ষু (দিব্যচক্ষু) নেই তারাই কেবল "আল্লা" নিরাকার একথা বলে থাকে। যেহেতু তাদের চক্ষু নেই তারা তো আল্লাহ্‌কে দেখার কোন প্রশ্নই আসেনা।

আবার যেহেতু আল্লাহ্‌র বা স্রষ্টার প্রাণ আছে তাই তাঁর খানা দানাও আছে। সুতরাং যারা একথা বলে যে, আল্লাহ্ প্রাণ আছে কিন্তু আকার নেই, পুত্র সন্তান নেই এবং আহার করেন না যুক্তি মতে তাঁরা বেঈমান।

উপরোক্ত সকল যুক্তির প্রেক্ষিতে রমিজ বলছেন তাঁর (স্রষ্টার) আকার সত্য আধ্যাত্মিকভাবে তালাশ করলে তিনি যে সাকারে আছেন তার তত্ত্ব পাওয়া যাবে। আর তাঁর (স্রষ্টার) তত্ত্ব জানতে পারলে তাঁকে সহজেই চিনা যাবে এবং তার পরিচয় ও সন্ধ্যান লাভ করতঃ তার নিকট আত্মসমর্পণ করে সৎগুরুর মাধ্যমে সাধনা করে জীবন মুক্তি পাওয়া যাবে। তবেই জন্মরোধ হবে এবং এ ধরাতে পুনঃজন্ম নিয়ে আর আসতে হবে না। পৃথিবীতে আসা যাওয়া নিজ ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ মুক্ত আত্মা ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হবেন।

বাণী নং-০৭ *"তুমি কর্মে বাঁধা জগৎ জোড়া*
তুমি আমি এক সুতে বাঁধা
জায়গা নাই তোর আমি ছাড়া"।

১। যার যে কর্মে আসে পুনঃ, কর্ম মতে হয় গঠন,
কর্মফল হয় না কর্তন, এই হল বিধানের ধারা।

২। তুমি বল জগৎ চলে ধর্মে, আমি বলি সব চলে কর্মে,
পাপপূণ্য যার যে কর্মে, কিছু নাই আর কর্ম ছাড়া।

৩। যদি বল তুমি আমি একা, আমি বলি তুমি নিতান্ত বোকা,
আমি বিনে তোর কোথায় জায়গা, বিশ্বাস করবে সব অন্ধ যারা।

৪। রমিজ কয় চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি,
আত্মজ্ঞানে জালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা।

***বিঃদ্রঃ** এই বাণীতে রমিজ কর্মবাদ, কর্মফল, ধর্ম-কর্ম ও মুক্ত বা মোক্ষ লাভ করা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তুমি বলতে "ভক্তকে বুঝিয়েছেন এবং আমি বলতে গুরু (সাঁঈ) বা স্রষ্টাকে বুঝিয়েছেন"।*

ব্যাখ্যা: সকল ভক্তই সারা বিশ্বব্যাপী কর্মে বাঁধা, তার মানে যে যা করছে, যে যা হচ্ছে, বা যে যেই অবস্থায়ই আছে সব-ই নিজ নিজ পূর্ব কর্মের ফল। গুরু (সাঁঈ) বা স্রষ্টা এবং ভক্ত প্রত্যেকে পূর্ব কর্মের (পূর্ব জন্মের) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ ভূমন্ডলে ভক্তের জীবন মুক্তি, মোক্ষ লাভ, আত্মার মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করার নিমিত্তে জন্মধারণ করে এসেছেন। সদ্‌গুরু ভক্তকে মুক্তির কর্ম ও পথ দেখাবেন এবং ভক্ত গুরুর আদেশ অনুযায়ী কর্ম করবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, আত্মা সমূহ কর্ম অনুযায়ী এবং পাপ পূণ্যের ফলাফল অনুযায়ী জন্মান্তরবাদ মতে দেহ লাভ করে বা দেহ গঠিত হয়ে পুনঃজন্ম লাভ করতঃ প্রাণী দেহে বিচরণ করছে। এখানে কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করবে বা করছে ইহাই ধ্রুব সত্য। ইহার কোন ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় ঘটবে না।

তারপর বলা হয়েছে যেহেতু স্রষ্টা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্ব সৃষ্টিতে সর্বক্ষণ বিরাজমান। তাই, জীব বা প্রাণী ছাড়া স্রষ্টার অন্য কোন স্থান নেই। সর্বজীবের অন্তরেই সাঁঈ বা স্রষ্টা বিরাজমান। মানবের কাল্‌বে বা হৃদয়ে স্রষ্টা বাস করেন। মানবের হৃদয়ে থেকেই তিনি অনাদি অনন্ত পর্যন্ত সকল মানুষের মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করার বিধান দিয়ে আসছেন।

সর্বশেষে উক্ত বাণীতে মহাগুরু রমিজ মানবাত্মার মুক্তি লাভের জন্য ভক্তরূপে বা ভক্ত হয়ে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করতঃ সর্বজীবকে ভালোবেসে তাঁর স্তুতি বা আরাধনা করার উপদেশ দিচ্ছেন। সর্বজীবের অন্তরে স্রষ্টার বাসস্থান আছে তা অনুভব করেই স্রষ্টাকে চিনে স্রষ্টার স্তুতি বা আরাধনা করে আত্মজ্ঞানের বাতি বা দিব্যচক্ষু, দিব্য জ্ঞান অর্জন করতঃ জিন্দায় মরা হয়ে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করার উপদেশ দিচ্ছেন। যার সব কিছু থেকেও কিছুই নেই তিনিই বিষয় বস্তু, আমিত্ব এবং স্বর্বস্ব অকাতরে বা অকুণ্ঠ চিত্তে সদ্‌গুরুর নিকট বিসর্জন দিয়েছেন তিনিই জিতে মরা হয়েছেন এবং মুক্ত বা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করেছেন।

বাণী নং-০৮ *"মন কার জন্য তোর এই চাকুরী*
যাবার কালে সব যাবে ফেলে
খাটবেনা তোর বাহাদুরী"।

১। স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, পেয়ে খুশি অবিরত,
নিত্য তুমি কর বধ, দেখনা কেন বিচার করি।

২। কর্মফলে এই ভূমন্ডলে, ঘুরে বেড়াও নিজের ভুলে,
বেলা নাই দেখ নয়ন খুলে, ডুবে যায় তোর সাধের তরী।

৩। আসলি কর্মের পাইতে খালাস, ইচ্ছায় কেন নিতেছ ফাঁস,
বধ করলে বধ হবে বিশ্বাস, জ্ঞানের চক্ষে দেখ চিন্তা করি।

৪। রমিজ কয় প্রাণ সবের সমান, ধর্মের নামে জীব দেও কোরবান,
কার গেল প্রাণ কে পূণ্যাবান, দেখ কেমন ছল চাতুরী।

বিঃদ্রঃ *মানুষ স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী কৃষি কাজ ইত্যাদি সহকারে সারা জীবন কাটিয়ে দেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় অত্যন্ত করুণ ও অসহায়ভাবে উক্ত সব কিছুই তুচ্ছজ্ঞান করে অত্যন্ত করুণভাবে বীরত্ব বা সাহসী জীবনের অবসান ঘটে থাকে। যাদের জন্য আজীবন ত্যাগ, তিতিক্ষা, ভাল-মন্দ যা কিছু করা হয়েছে মৃত্যুর সময় তাঁরা শুধু নীরব-নির্বাক দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। যাদের হিতার্থে বা মঙ্গলের জন্য আজীবন অনেক কিছু করা হয়েছে ঐ সকল কর্মকান্ডকেই মহাগুরু রমিজ পরিবার পরিজনের জন্য চাকরের ন্যায় চাকুরী আখ্যায়িত করেছেন। এ বাণীতে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে।*

ব্যাখ্যা: মানুষ স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ী, নারী ইত্যাদির মালিক হয়ে দুনিয়াদারীর কাজে ব্যস্ত হয়ে আনন্দ চিত্তে দিন কাটায়। তারা খাদ্য লালসার নিমিত্তে অহরহ জীব হত্যা করতঃ উহার মাংস

ভক্ষনে লিপ্ত থাকে। ভুলে যায় তারা আত্মার সমঅধিকারের কথা। ভুলে যায় তারা আত্মার সুমহান মুক্তি এবং নির্বাণের কথা। সর্বদা পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। অথচ উক্ত হত্যা কর্মের কোন বিচার বিবেচনার ধার ধারে না। হত্যা কর্মের এই ভুলের জন্য মানুষ পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন আকারের পশুতে জন্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুরু রমিজ বলছেন পৃথিবীতে মানুষ তাঁর পূর্ব ভুল কর্মের (পূর্ব জন্মের) কর্মফলকে খন্ডন করে তাঁর খালাস পাবার বা পরিত্রাণ পাবার জন্য পৃথিবীতে মানব জনম নিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ তা না করে আবারও হত্যা কর্ম করে মানব হত্যার ন্যায় বিচারে ফাঁস নিতেছে। বধের পরিবর্তে পুনরায় পশু জন্মধারণ করে বধ হতে হবে, ইহাই জ্ঞান এবং বিবেক সম্মত বিচার। এ বিচার জ্ঞানের চক্ষু (দিব্যচক্ষু) দ্বারা দেখা যায়। জ্ঞানের চক্ষু দ্বারা বিচার করে দেখার জন্য গুরু রমিজ উপদেশ দিয়েছেন।

মহাগুরু রমিজ বলেছেন, মানব এবং অন্যান্য প্রাণী, সকলের প্রাণ বা আত্মা একই জিনিস, একই সমান। প্রত্যেকের প্রাণ বা আত্মা একই পরমআত্মার জাত।

মানুষ ধর্মের নামে পশু বা প্রাণী হত্যা করতঃ পূণ্যবান হতে চায়। রমিজ বলছেন ***"কার গেল প্রাণ, কে পূণ্যবান, দেখ কেমন ছল চাতুরী"***। অর্থাৎ এক জনের প্রাণ বধ করে অন্য একজন পূণ্যবান হবে- ইহা স্রষ্টার সাথে ছল চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোরবানের নামে জীব বা অন্য প্রাণী হত্যা না করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন কেহই দিতে পারে না। তাই, অন্য নিরীহ প্রাণীকে কোরবানীর নাম করে হত্যা করা নিজের বিবেকের সাথে এবং নিজ পরম আত্মার সাথে তথা স্রষ্টার সাথে ছল চাতুরী করারই শামিল মাত্র।

বাণী-০৯ *"বেশ ভূষাতে হয় না ঋষি*
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিনে
জাতে জাতে মিশামিশি"।

১। লম্বা চুল মাথে জটা, পুরুষে দিলে মেয়ের ঘোমটা,
পায়না তারে নাচলে খেমটা, ঘটে ঘটে দেখ আছে বসি।

২। লাল হলুদ বেশ পরিলে, আরও যদি দেয় তস্‌বি গলে,
পায়না তারে ভূমন্ডলে তালাশ করিলে দিবানিশি।

৩। জীবের গলায় দিয়া ছুরি, কর তুমি বাহাদুরী
দেখ তুমি চিন্তা করি, তোমার কর্মে কেবা দোষী।

৪। রমিজ কয় জাননা মর্ম, নিত্য তোমার হত্যা কর্ম,
প্রাণী বধে হয় না ধর্ম, ইচ্ছা করে নিলা ফাঁসী।

বিঃদ্রঃ *ঋষি শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞতপস্বী, শাস্ত্র প্রণেতা, বেদ মন্ত্রের সংকলয়িতা যোগী, বাকসিদ্ধ পুরুষ, বিদ্যা তপশ্রুতি (বেদ) ও সত্য যার আয়ত্তে তিনিই ঋষি। মহাগুরু রমিজ বলেন, কেবল বেশভূষা ধারণ করলেই ঋষি হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা যিনি নিজকে নিজে চিনতে পেরেছেন তিনিই স্রষ্টার জাতের সঙ্গে লয় বা বিলীন হয়ে গেছেন। তিনি দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এবং তিনিই প্রকৃত ঋষি।*

ব্যাখ্যা: উক্ত বেশভূষা সম্বন্ধে গুরু রমিজ বলেন, মাথায় জটা, লম্বাচুল ধারণ করে পুরুষে মেয়ের ন্যায় ঘুমটা দিয়ে খেমটা তালে আল্লাহু বলে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নাচলে স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না।

আমাদের লোকালয়ে লোক দেখানো ও লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোন কোন লোককে দেখা যায় যে, তারা লাল হলুদ জামা পরিধান করে, গলে তসবী ঝুলায়ে, মাথায় জটা রেখে, ফকিরীর ভান ধরে, মানুষকে আকৃষ্ট করে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়। এ জাতীয় ভন্ড লোকেরা দিবারাত্রে স্রষ্টাকে ডাকাডাকি ও তালাশ করলেও তাঁর সান্নিধ্য পাবে না।

এ বাণীতে আরো বলা হয়েছে যে, জীবের গলে ছুরি চালিয়ে বীরত্ব বা বাহাদুরী দেখিয়ে জীব হত্যা করে পেট ভরে উহার মাংস ভোজ করলে- ইহা অতীব দোষনীয়। নির্বিচারে নিরীহ প্রাণী হত্যা করা মানব হত্যার ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী। হত্যার এ বিষয়টি চিন্তা করার জন্য গুরু রমিজ তাঁর ভক্তগণকে আহ্বান করছেন। উল্লেখ্য যে, জন্মান্তরবাদের নীতি অনুযায়ী মানব হত্যা করলে বিচারে যেমন ফাঁসী হয় তেমনি প্রাণী ও জীব হত্যা করলেও মানবের ন্যায় ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে পুনঃজন্মে উক্ত প্রাণীতে জন্ম নিয়ে অন্যের হাতে হত্যা (ফাঁস) হতে হবে। তাই, গুরু রমিজ বলেন যে, প্রাণী বধে কোন ধর্ম কর্ম হয় না।

বাণী নং-১০ *"তোরে আর কত বুঝাব বলিয়া*
অন্ধের সামনে ধরিলে দর্পণ
কি ফল হবে দেখ ভাবিয়া"।

১। সদা সর্বদা সঙ্গে থাকি, কারে কর তুমি ডাকাডাকি,
তোর সাথে মোর মাখামাখি, অন্ধ হলে কেন চক্ষু থুইয়া।

২। তুমি বল সে আছে নিরাকার, না দেখি কিভাবে করিলা প্রচার,
আমি বলি তাঁর অনন্ত আকার, বিশ্বব্যাপী আছে দেখ চাইয়া।

৩। যার যে কর্মফল আছে সে ভুগিতে, নররূপে কিংবা যাইয়া পশুতে,
না হলে আত্মজ্ঞান- নাহি পরিত্রাণ, প্রতি ঘটে বেড়ায় ঘুরিয়া।

৪। রমিজ বলে কর কর্মের সন্ধান, কি কর্মে তুই পাবি পরিত্রাণ,
হলে আত্মজ্ঞান দেখবি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যক্ত হবে সত্য দেখিয়া।

বিঃদ্রঃ *এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ তাঁর মূল তত্ত্ব কর্ম, কর্মফল, কর্মবাদ, আত্মজ্ঞান ও পরিত্রাণ বা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আরো তিনি মানুষের মন, জ্ঞান ও বিবেকের ভাব ও কথোপকথোন উপস্থাপন করেছেন।*

ব্যাখ্যা: মানুষের জ্ঞান ও বিবেক তাঁর মনকে এখানে অন্ধ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। কারণ, মন যদি সর্বদা ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা করে কর্মকান্ড করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানুষ কখনো ভুল কাজ করতো না।

মানব মন সাধারণতঃ মন্দ কাজের দিকেই ধাবিত হয়, কারণ মন হলো মানবের সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। মন সর্বদা ইন্দ্রিয়কে কুপথে ধাবিত করে বেশী। তাই মন সর্বদা অন্ধ অবস্থায় থাকে।

তাই উক্ত বাণীর প্রথমেই মহাগুরু রমিজ একটি উপমা দিচ্ছেন যে, একজন অন্ধ লোকের সামনে একটি দর্পণ বা আয়না যেভাবেই ধরা হোক না কেন, অন্ধ লোকটি কোন মতেই তাঁর স্বীয় চেহারা আয়নার ভিতর দেখতে পাবে না। কারণ অন্ধের দর্শনেন্দ্রিয় বিকল অবস্থায় আছে। এ জন্যেই রমিজের বিবেক এবং জ্ঞান তাঁর মনকে বলছে ***"স্রষ্টা পরমাত্মা হিসেবে নিজ দেহেই (মানব দেহে ও মানবরূপে) সর্বদা বিরাজমান আছে। মন দ্বারা সংগঠিত সকল কর্মের মধ্যেই পরমআত্মা অর্থাৎ স্রষ্টার উপস্থিতি আছে। মনের সকল ভুল বিসর্জন করতঃ দিব্যচক্ষু অর্জন করলেই ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরম স্রষ্টার উপস্থিতি ও মাখামাখি অনুভব করা যায় ও দেখা যায়"।*** সুতরাং, স্রষ্টাকে দূরে ভেবে ডাকাডাকি করা নিষ্প্রয়োজন।

কারো মতে স্রষ্টা নিরাকার। তাদের উদ্দেশ্যে উক্ত বাণীতে মহাগুরু রমিজ বলছেন যার আকার নেই (নিরাকার) তাকেতো দেখা যায় না। না দেখে স্রষ্টা নিরাকার একথা কিভাবে প্রচার করা হলো। এদিকে রমিজের সিদ্ধ আত্মা ও বিবেক বলেছেন ***"স্রষ্টা অনন্ত আকারে বিরাজিত, তিনি (স্রষ্টা) সর্বভূতে, সর্বত্র, সর্বসময়, সর্বভূমে, সর্বব্যাপী বিরাজমান এমনকি যেখানে কিছুই নাই সেখানেও তিনিই আছেন"।*** আর সে জন্যেই গুরু রমিজ বলছেন ***"বিশ্বব্যাপী আছে দেখ চাইয়া"।*** যার অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষু খোলা আছে তিনিই তাঁকে (স্রষ্টাকে) দেখতে পাবেন।

কর্মফল সম্বন্ধে রমিজ বলেছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল মানবরূপে কিংবা জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী কর্ম মতে নিম্নস্তরে পশুতে জন্ম নিয়ে কর্মফল ভোগতে হবে। আরো বলা হয়েছে যে, যারা আত্মজ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাই পরিত্রাণ, মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করবেন। যারা আত্মজ্ঞান অর্জন করতে না পারবেন তাঁরা প্রতি ঘটে ঘুরিয়া বেড়াবে অর্থাৎ জীবনচক্রে (৮৪ লক্ষ প্রকার) সর্বজীবে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে হবে। সর্বশেষে গুরু রমিজ যে কর্ম সম্পাদন করলে পুনঃ জন্ম হতে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, তাহা সঠিকভাবে সন্ধান করার জন্য তাঁর ভক্তগণকে আহ্বান করছেন।

আরও বলছেন, আত্মজ্ঞান অর্জন করতে পারলে দিব্যচক্ষু দ্বারা সবকিছুর পরিচয় পাওয়া যাবে এবং সত্য কর্মের সন্ধান করতঃ সৎকর্ম করে জন্মচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করে জীবন মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে।

<u>বাণী নং-১১</u> *"কারে কর তুমি ডাকডাকি*
কোথায় ছিলে কোথায় এলে
কোথায় যাবে পথ ভোলা পাখি।"

১। ডাকলে কিন্তু দেয় না সাড়া, ডেকে ডেকে আত্মহারা
শোনে না সে কর্ম ছাড়া, বিচার কর কি আছে বাকী।

২। যার নামে জীব কর দান, সকলে তারই সন্তান,
না বুঝিয়া বধিলে প্রাণ, শেষকালে তোমার উপায় কি ?

৩। পরকে করি বলিদান, তুমি বল আমি পূণ্যবান,
তা না করি নিজে দেও প্রাণ, দেখি কেমন আত্মত্যাগী।

৪। নিজের কর্ম হইলে বিশ্বাস, রমিজ বলে মিলবেরে পাশ,
হবে না কার অবিশ্বাস, সর্বজীবে দিবে সাক্ষী।

ব্যাখ্যাঃ

স্থায়ী- এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ আত্মসমূহ কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, মৃত্যুর পর আবার কোথায় যাবে এ প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করেছেন। মানুষ অবিরত কাকে ডাকছে বা কার উপাসনা করছে তাও প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী বাক্যগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো শুধু এখনকার জন্যই নয়। এগুলো মানবজাতির অতি সনাতন জিজ্ঞাসা। যুগে যুগে মহামানবগণ বিভিন্নভাবে বহুধাবিভক্ত মানব জাতিকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে মানব মনের উক্ত জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন) সমূহের সমাধান দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করে আসছেন। উপরন্তু মানব মনের অধ্যাত্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের বহুবিধ উপায় ও উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছেন।

মহাগুরু রমিজও তাই করছেন। তাঁর মতবাদ মতে মানব মনের উক্ত বিষয়গুলোর সমাধানকল্পে তিনি অত্র বাণীর মাধ্যমে কর্ম ও কর্মফল বা কর্মবাদ অনুযায়ীই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের মানুষ স্রষ্টার আরাধনা করার নিমিত্ত্বে বহুরূপীভাবে তাকে ডাকছেন। গুরু রমিজ এ বাণীতে প্রথমেই বলেছেন "কারে কর তুমি ডাকাডাকি"। ইহাতে এ কথাই সুস্পষ্ট যে, যার আরাধনা করা হচ্ছে এবং যাকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে-

- *তাঁর পরিচয় কি ?*
- *তিনি কে ?*
- *তাঁকে চেনা হয়েছে কি ?*

পাখি যেমন পথ ভুলে গেলে আর তার নীড় বা বাসস্থান বা বাসা খুঁজে পায়না, তদ্রুপ মানুষ কোথা হতে এসেছে, কোথায় এসেছে, মৃত্যুর পর কোথায় যাবে ও কার আরাধনা করছে তা না জেনে অর্থাৎ কার আরাধনা করছে তাঁর ঠিকানা বা পরিচয় না জেনে, না চিনে তাঁকে (স্রষ্টাকে) আরাধনা করলে উপরোক্ত পথভুলা পাখির মত মানুষেরও

একই অবস্থা দাড়াবে। নীড় হারা পাখির মত মানুষ পথভুলা হয়ে চক্রাকারে ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রাণীতে ভ্রমণ করতে থাকবে ***(রমিজ মতবাদ মতে বা পুনর্জন্মবাদ মতে)***। এখানে উল্লেখ্য যে, স্রষ্টা প্রেরিত মহামানব ও মহাশক্তি দ্বারা প্রচারিত বিধানই মানবের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ। ইহা মানুষকে জীবনচক্র হতে পরিত্রাণ দিতে পারে। এ বিধান মতে কর্ম করলে, সদ্‌গুরু অনুগত হয়ে আত্মবোধ সৃষ্টি করতঃ মানুষ মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে।

অন্তরা-১ ঃ মানুষ নাম জপ, ধ্যান, জিকির ইত্যাদি বহুবিধ পদ্ধতিতে স্রষ্টাকে ডাকতে ডাকতে আত্মহারা হয়ে যান। অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভুলে যান। তথাপি স্রষ্টা কোন সাড়া দেন না।

গুরু রমিজের মতে আত্মকর্ম ব্যতীত শুধু স্রষ্টাকে ডাকাডাকিতে তিনি শোনবেন না। স্রষ্টা মানবের অনুতপ্ত হৃদয় দ্বারা কৃতকর্মের দিকে চেয়ে আছেন। কারণ ***কর্মই সকল ধর্ম মতের মূল সূত্র***। আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় ***'কর্মই ধর্ম'***। যা হলো কর্মবাদের মূল তত্ত্ব।

অন্তরা-২ ঃ অতঃপর গুরু রমিজ বলেনও স্রষ্টার নামে বা স্রষ্টার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জীবকে কোরবান অথবা বলিদানের নামে হত্যা বা বধ করা হলে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কারণ মানবসহ সকল জীবই স্রষ্টার সন্তান। পিতার সামনে এক সন্তানকে অপর সন্তানে বধ করলে পিতা যেমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তদ্রুপ মানুষও স্রষ্টার নামে অপর প্রাণীকে হত্যা বা বধ করলে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

অন্তরা-৩ ঃ গুরু রমিজ আরো বলেছেন, মানুষ অন্য প্রাণীকে হত্যা করে নিজকে পূণ্যবান বলে দাবী করছেন। তা না করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে এমন কে আছে ? স্রষ্টাকে খুশী করার জন্য প্রাণী হত্যার পরিবর্তে নিজের প্রাণ বিসর্জন যিনি দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত আত্মত্যাগী। *মূলতঃ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার মত লোক বা পাত্র একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।*

অন্তরা-৪ (আভোগ) ঃ সর্বশেষে মহাগুরু রমিজ বলেন *"নিজের কর্ম হলে বিশ্বাস, রমিজ বলে মিলবে রে পাশ, হবে না কার অবিশ্বাস, সর্বজীবে দিবে সাক্ষী"।*

যিনি নিজকে নিজে চেতন গুরু বা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছেন তিনিই স্রষ্টাকে চিনেছেন এবং অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ও দিব্যচক্ষু দ্বারা (অন্তরচক্ষু) স্রষ্টাকে দেখে তাঁর স্বরূপ অনুভব করবেন। এ অবস্থায় আত্মসমর্পনকারীর সকল কর্মের প্রতি তার নিজের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। তাঁর এ সৎকর্মের জন্য সর্বজীবে বিরাজমান স্রষ্টা অতীন্দ্রিয়ের দৈববাণী বা এলহাম যোগে প্রমাণ দিবেন। তা হলেই তিনি জন্মচক্র পাস করবেন এবং জীবন মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করবেন। অর্থাৎ, তাকে আর পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে না। জন্ম মৃত্যুকে তিনি জয় করলেন, পাশ করলেন বা অতিক্রম করলেন।

বাণী নং-১২ *"কাজ কি আমার তাঁরে ডেকে,*
সেতো হৃদয়ের ধন খোদ মহাজন
ঘরের মালিক ঘরে থাকে"।

১। যখন যাহা করি মনে, আমার অন্তর্যামী সকল জানে,
ডাকলে উত্তর দিবে কেনে, আমার কর্ম সে চেয়ে থাকে।

২। শুনছি তাঁর নাই আহার বিহার, আরো শুনছি সে নিরাকার,
আকার নাই যার দরকার কি তার, খোঁজলে তাঁরে পায়না লোকে।

৩। কোনরূপে তাঁরে করিব ভজন, প্রতি ঘটে খোদ মহাজন,
নররূপে কর স্মরণ, রমিজ বলে পাবি তাঁকে।

ব্যাখ্যাঃ

(স্থায়ী) ঃ মানবদেহ স্রষ্টার গড়া ঘর। এ ঘরের ভিতর হৃদয়ে (কাল্‌বে) তিনি অবস্থান করেন। তিনি হৃদয়ের একমাত্র সম্বল (ধন) এবং তিনিই স্বয়ং বা খোদ ইহার মালিক আর তিনিই সর্বদা ইহা দেখেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

১। গুরু রমিজ এখানে বলেছেন স্রষ্টা অন্তর্যামী, তিনি সবই জানেন এবং দেখেন। সুতরাং তাকে শুধু শুধুই ডাকলে তিনি উত্তর দিবেন না। তিনি কেবল মানুষের কর্মকান্ডগুলোই পর্যবেক্ষণ করেন। মানবের কর্ম অনুযায়ী তিনি কর্মফল দিবেন। তাই, তিনি সকলের কর্মের দিকে চেয়ে আছেন।

২। মহাগুরু রমিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে বলেছেন "শোনা যায় তিনি (স্রষ্টা) আহার বা খাদ্য গ্রহণ করেন না। কোন স্থানে বিহার বা বিচরণও করেন না। তিনি নিরাকার। তাকে খোঁজলে লোকে কোথাও পায় না"। তাহলে যার আকার নাই, খোঁজলে পাওয়া যায় না তাঁর দরকারইবা কি ?

৩। তবে স্রষ্টাকে কোন্ রূপে আরাধনা করতে হবে এ বিষয়ে মহাগুরু রমিজ বলেন "স্রষ্টা প্রত্যেকটি মানবের কাল্‌বে বা হৃদয়ে বাস করেন"। তাই, যেহেতু মানবদেহ স্রষ্টার ঘর, মানব হৃদয়ে স্রষ্টার বাসস্থান সেহেতু মানবরূপ বা নররূপেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। পৃথিবীতে যত অবতার ও নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন সবাই মানবরূপে। দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টিলগ্ন হতেই স্রষ্টা মানব আকারকে বেশী পছন্দ করে আসছেন। সুতরাং নবী-রাসূল, অবতার, মহামানব সকলের আত্মাই স্রষ্টা বা পরমেশ্বরের জাত। তাঁদের সকলের অসীম পরম আত্মা স্রষ্টার অসীম পরম আত্মার সহিত লয় হয়ে আছে।

সুতরাং মানবরূপেই (নরুরূপে) স্রষ্টার আরাধনা করা শ্রেয়।

এ সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন "মানবকে ভালোবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি মানবেতে আছেন প্রভু তাঁরে জানাও স্তুতি"

উপদেশ-৯ (অলৌকিক সুধা)

এ উপদেশ বা সিদ্ধবাক্যে ইহাই বুঝানো হচ্ছে যে, স্রষ্টা মানবের কাল্‌বে বা হৃদয়ে অবস্থান করছেন। তাঁই মানবকে বা মাবনজাতিকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হয়।

দারেমী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে গাউসে পাক বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) তাঁর "সিররুল আসরার নামক কিতাবের ১২১ পৃষ্ঠায় হযরত রাসূল (সঃ) এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হলো হযরত রাসূল (সঃ) বলেন-

[রা আইতু রাব্বি আলা সুরাতি শব্বিন আমরুদ]

অর্থ ঃ ***"আমি আমার প্রভুকে দাঁড়ি গোফ বিহীন যুবকের আকৃতি বিশিষ্ট দেখেছি"।***

[সিররুল আসরার মূলঃ বড়পীর সাহেব (রহ) ।]

অনুবাদ আবদুল জলিল, পরিবেশনায় ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৫ আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০। প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬ ইং।

আল্লামা বদরুদ্দীন আকবরাবাদী কর্তৃক প্রণীত ১৩২১ হিজরী জিলকদ, ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারী দিল্লী থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত কিতাব দেওয়ান ই হাফিজ-এর "শরাহ বদরু শরুহ্" এর ২০৪ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহতায়ালা বিবি মরিয়মের কাছে যে মানব আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

[ফা আরসালনা ইলাইহা রুহানা ফাতামাস্‌সালা লাহা বাশারান সাওইয়্যান]

অর্থ ঃ ***"আমি তাঁর (মরিয়মের) নিকট আমার রুহ প্রেরণ করলাম সে তার নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করল" (সূরা-মরিয়ম, আয়াত-১৭)।***

মহান আল্লাহ্‌তায়ালা যে নিজের রূপে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল ফরমান-

[ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা ছুরাতিহী]

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন"
(মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড) ।

প্রিয় পাঠকবৃদ্ধ, মহাগুরু রমিজ, পবিত্র কোরআন, হাদীস শরীফ ও মহা মানবগণের বাণী মোবারক থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা (আল্লাহ্) মানবরূপ ধারণ করেই তাঁর প্রিয় আশেকান বা পরম ভক্তকে দর্শন দিয়ে থাকেন ।

উপরোল্লিখিত স্রষ্টার মানবাকার ধারণ করার যুক্তিগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরম আত্মার মানব আকার হলো "স্রষ্টারই প্রতিচ্ছবি" । আর স্রষ্টা মানবরূপেই মহামানবের কাছে ধরা দিয়ে থাকেন ।

বাণী নং-১৩ *"মন দেখে যা তুই এ সংসারে*
বলি তোরে তোর কর্ম ফেরে
আসা যাওয়া বারে বারে" ।

১ । যার হয়েছে আত্মবোধ, তার হইল কর্মরোধ
হইল সে খোদে খোদ, যখন যা তার ইচ্ছায় করে ।

২ । আত্মজ্ঞানে হয় নির্বাণ, এই হইল বিধির বিধান
কর্মরোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে ।

৩ । কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম, কর্ম দিয়া রোধ কর কর্ম
ডাকা ডাকিতে হয় না ধর্ম, না দেখিয়া ডাক কারে ।

৪ । রমিজ কয় তার সকল ফাঁকি, ঠিকানা নাই কারে ডাকি
সর্বজীবে দেখ সাক্ষী, অনন্তরূপে বিরাজ করে ।

ব্যাখ্যা ঃ এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ কর্মফল, কর্মরোধ, জন্মান্তরবাদ, আত্মজ্ঞান, আত্মবোধ ও স্রষ্টা অনন্তরূপী এ বিষয়গুলো তাঁর ভক্তদের সামনে উপস্থাপন করেছেন ।

১। যিনি নিজের ভাল মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে, সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে ধ্যান যোগে সাধনার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান অর্জন করেছেন অথবা যিনি আত্মচেতনা (নিজ চেতনা) দ্বারা চৈতন্যময় হয়েছেন তিনি নিজকে নিজে বোধ (চিনতে পেরেছেন) করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তিনিই আত্মবোধ অর্জন করেছেন। আর যিনি এ আত্মবোধ লাভ করেছেন তিনি দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু দ্বারা সব বুঝেন, সব দেখেন ও সব শোনেন। তাই তাঁর সকল কর্মফল জানা আছে। তিনি কর্ম দ্বারা কর্মবোধ করতে সক্ষম। আর তিনি খোদার জাতের সঙ্গে লয় হয়ে খোদে খোদ হয়েছেন।

২। পরবর্তী পর্যায়ে গুরু রমিজ বলেন "আত্মজ্ঞানে হয় নির্বাণ, এই হইল বিধির বিধান, কর্ম রোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে"।

এখানে মহাগুরু রমিজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলছেন- আত্মজ্ঞান বা আত্মচেতনার অধিকারী যিনি তিনি-চৈতন্যময় হয়েছেন। তিনিই স্রষ্টার বিধানমতে নির্বাণ বা জন্মচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। মহাগুরু রমিজের জন্মান্তরবাদ- এর জন্ম-মৃত্যু রোধ করেছেন। তাকে জন্ম নিয়ে আর ধরায় আসতে হবে না।

আর যিনি কর্মরোধ প্রাপ্ত হয়েছেন তার প্রমাণ হিসেবে তিনি স্রষ্টার তরফ হতে নিত্য দৈববাণী এলহাম ওহী ইত্যাদি সংবাদ পাবেন।

৩। এরপর গুরু রমিজ বাণীতে ৩নং অন্তরায় যা লিখেছেন তাঁর ব্যাখ্যা বিবরণ হলো- কর্ম ছাড়া কোন ধর্ম হতে পারে না। অর্থাৎ ধর্ম বলতেই অনেক কর্মের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ দেয়া থাকে। আদেশ এবং উপদেশে উল্লেখিত কর্ম সম্পাদন করতঃ অথবা উল্লিখিত আদেশ উপদেশের কর্মগুলো (সৎ কর্মগুলো) সম্পাদন করতঃ অসৎ কর্মকে রোধ করা যায়।

কর্ম সাধন করা ছাড়া কেবলমাত্র স্রষ্টাকে না চিনে, না দেখে, ডাকাডাকি করলেই ধর্ম পালন করা হলো না। আগে স্রষ্টাকে চিনতে হবে, তাঁর স্বরূপ দেখতে হবে, অতঃপর ধর্ম কর্ম করতে হবে।

৪। সর্বশেষে রমিজ বলেন- স্রষ্টার পরিচয় ও ঠিকানা না পেয়ে অচেনা, অজানা নিরাকার (যার অর্থ কিছুই নাই) হিসেবে অন্ধের মত আন্দাজ করে তাঁকে ডাকলে কোন লাভ হবে না।

তবে গুরু রমিজের মতবাদ মতে- স্রষ্টা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বত্র অনন্তরূপে অবিরাম বিরাজ করছে। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান। সৃষ্টিকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো। সর্বজীবই স্রষ্টার বিদ্যমানবতার সাক্ষী। যথা সৃষ্টি তথা স্রষ্টা। তাই সর্বজীবের আরাধনা করলেই স্রষ্টার আরাধনা করা হলো।

আর আরাধনা করতে হলে আরাধনার আইন বা বিধান জানতে হবে। এ বিধান জানতে হলে- আরেকজন মহামান্য আরাধ্য ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী কর্ম ও তাঁর সঙ্গ করতে হবে। তাঁকে অনুস্মরণ ও অনুকরণ করতে হবে। তাঁর নিকট আমিত্বকে বিসর্জন করতে হবে। রমিজের ভাষায় সেই আরাধ্য মহান ব্যক্তিই হচ্ছেন "সদ্‌গুরু"।

সদ্‌গুরুই ক্রমে ক্রমে তাঁর পরম ভক্তকে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ক বা অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান, অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ঐশ্বিরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞান ইত্যাদি বিতরণ পূর্বক দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

উক্ত দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু দ্বারা স্রষ্টার ঠিকানা, পরিচয়, অনন্তরূপ, অনন্ত শক্তি, এছাড়াও পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের অন্যন্য ভূমের খবরও বলতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, মহাগুরু রমিজ বলেছেন পৃথিবী ছাড়া আরো অনেক সৌরমন্ডল আছে যেখানে অনেক ভূম (গ্রহ) রয়েছে এবং ঐগুলোতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ও তাদের পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে।

বাণী নং-১৪ *"কারে কর তুমি প্রবঞ্চনা*
সর্বজীবে বিরাজমান
দেখে হইলনা বিবেচনা"।

১। পথের তোমার নাইরে সন্ধান, অন্ধ আর তুমি সমান,
হত্যা কর জীবেরই প্রাণ, নিজের প্রাণের ভয় করনা।

২। জীব মাত্র ভগবান, যদি কর বলিদান
রইল তার প্রতিদান, তোর কাঁদন আর কেউ শোনবেনা ।

৩। পিতার পুত্র সবে সমান, মূর্খ কুপুত্র বিদ্বান,
জেনে শুনে বধিলে প্রাণ, সেই দোষের ক্ষমা পাবিনা।

৪। জীবে দয়া আত্মদান, তুষ্ট থাকে ভগবান,
রমিজ কয় শাস্ত্রে প্রমাণ, জীব ছাড়া কোথায় পাবিনা।

ব্যাখ্যাঃ

(স্থায়ী)ঃ স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান। তাহলে, যে কোন প্রাণী জীবকে আঘাত বা হত্যা করা হলে সে আঘাত বা হত্যা স্রষ্টাকেই করার সামিল হলো। ইহা জেনেও যদি কোন ব্যক্তি উক্ত অশুভ কর্ম করে, তবে উহা স্রষ্টার সহিত প্রবঞ্চনা করা হলো- ইহাই প্রতীয়মান হয়।

১। মহাগুরু রমিজ বলেছেন- স্রষ্টার সন্ধান তোমাদের জানা নেই। তাঁর পরিচয় তোমরা জান না। তাই তোমরা স্রষ্টার বিধান বা পথ সম্বন্ধে অজ্ঞ। স্রষ্টার বিধান বা তাঁকে আপন করে পাবার যে পথ এ সম্বন্ধে যারা জানে না তাদেরকে গুরু রমিজ অপার্থিব জগতের অন্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনবরত জীবের বা প্রাণীদের প্রাণ নাশ করতেছে। অথচ হত্যাকারীরা নিজের প্রাণের ভয় করেনা। অর্থাৎ যারা প্রাণীর প্রাণ নিধন করছেন তাদের প্রাণ যদি কেহ নিধন করতেন সে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের এবং

যাতনার ভয় কাহারো নেই। ইহা যেন অতি সাধারণ এবং নিত্যদিনের আনন্দ ও খাদ্য লালসার একটি চমকপ্রদ বিষয়।

২। হত্যাকারীর প্রাণ এবং হত্যাকৃত জীবের প্রাণ একই সমতুল্য প্রাণ। কোন প্রাণই অন্যের প্রাণ হতে কোন দিক থেকেই কম বা বেশী নয়। মানব হত্যার বিচার হলো ফাঁসী। তাই জীব হত্যার বিচারেও হত্যাকারী মানুষ পুনঃজন্মে হত্যাকৃত অনুরূপ জীবে জন্ম নিয়ে স্রষ্টার বিধান মতে অন্যের দ্বারা হত্যা হতে হবে। যেহেতু জীবমাত্র ভগবান তাই জীব হত্যা মানেই ভগবান বা স্রষ্টাকে হত্যা করার সামিল। ইহার প্রতিদান বা প্রতিশোধ পেতেই হবে। তার জন্য কোন কান্নাকাটি বা হা'হুতাশ করলে কোন কাজ হবে না।

৩। পিতার মত পুত্রই থাকুক না কেন, মূর্খ, কুপুত্র, বিদ্বান সকলই পিতার নিকট সমান। তদ্রুপ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা জীব সকলই স্রষ্টার সন্তান। সবাই একই প্রাণ বিশিষ্ট প্রাণী। সুতরাং, প্রত্যেক প্রাণী বা জীবই স্রষ্টার নিকট (পিতার নিকট) সমমর্যাদা প্রাপ্য। অতএব, জেনে শুনে প্রাণী হত্যা করলে এই হত্যা দোষের কোন ক্ষমা স্রষ্টা (পরম বিচারক) করবেন না।

৪। সব শেষে মহাগুরু রমিজ বলেন- "জীবে দয়া আত্মদান তুষ্ট থাকে ভগবান"। অর্থাৎ সর্বজীবের উপকারার্থে যিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন তাঁর প্রতি স্রষ্টা সন্তুষ্ট থাকেন।

এখানে সর্বজীবের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা মানে স্রষ্টার জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করা। কারণ, সর্বজীবে স্রষ্টা বিরাজমান। তাই, উক্ত মতে প্রাণ উৎসর্গকারীর প্রতি স্রষ্টা অবশ্য সন্তুষ্ট ও খুশি থাকারই কথা। গুরু রমিজ ইহাও বলতেছেন যে, জীব ছাড়া স্রষ্টাকে কোথাও পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব শাস্ত্রসম্মত মতবাদ। তাই সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা মানুষের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

বাণী নং-১৫ *"দেখলিনা মন চিন্তা করি*
তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম
ঘটে ঘটে ঘুরাফিরি"।

১। আসলি কর্মের পাইতে মুক্তি, প্রাণী হত্যা তোর নিত্যি নিত্যি
দেখেশুনে কর ডাকাতি, আর কত কর বাহাদুরী।

২। চৌরাশি করিয়া ভ্রমণ, পেয়েছে এবার মানব জনম
জন্ম মৃত্যু কিসে বারণ, তালাশ কর তাড়াতাড়ি।

৩। কর্ম দিয়া কর্ম মুক্ত, দৈববাণীতে হবে ব্যক্ত,
তোমার মধ্যে যে সেই সত্য, আর কিছু নাই সব ছল চাতুরী।

৪। রমিজ কয় এবার মান প্রবোধ, কর্ম দিয়া জন্ম রোধ,
দেখবে নিজে খোদে খোদ, দখল হবে জমের কাচারী।

ব্যাখ্যা :

(স্থায়ী) ঃ এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ কর্ম অনুযায়ী ফল, কর্মফল, কর্মবাদ, জন্ম ও জন্মরোধ, মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় ইত্যাদি ব্যক্ত করেছেন।

রমিজ বলেন ***"তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম, ঘটে ঘটে ঘুরাফিরি"।***

অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জেনে বা না জেনে পৃথিবীতে বহুবিধ অপকর্মে জড়িত হয়ে থাকে। দেখা যায় যে, মানুষ হয়ে অনেকে পশুসুলভ আচরণ ও কর্ম সম্পাদন করে। মহাগুরু রমিজের মতবাদ মতে যে মানুষ অন্য মানুষ বা প্রাণীর সাথে কুকুরের ন্যায় আচরণ ও কর্ম করে তাঁর আত্মার স্বভাব ও চেহারা ক্রমশ কুকুর রূপ ধারণ করছে। অনুরূপভাবে যে শুকরের ন্যায় আচরণ ও কর্ম করবে তাঁর আত্মা ক্রমশ শুকরের স্বভাব ধারণ করছে। জন্ম ও জন্মান্তরবাদ মতে উক্ত মানবাত্মা দু'টি কর্মফলে পরবর্তী জনমে যথাক্রমে কুকুর ও শুকরের দেহ ধারণ করতঃ জন্ম নিবে। এভাবে মানব আত্মাসমূহ যদি সৎকর্ম করে তবে তাদের আত্মাগুলো পরম মানবরূপে এমনকি মহামানবরূপেও জন্মধারণ করতে পারে। জন্মান্তরবাদ মতে যারা বিশ্বাসী তাদের মতবাদ হলো- যে যেই পশুতে বা যেই আকারে

পরবর্তী জন্ম নিবে, মানবরূপে থাকাকালীন সে আগেই উক্ত পশুসুলভ আচার, আচরণ, কর্ম ইত্যাদি এমনভাবে করতে থাকে যে, তাঁর আত্মা সংশ্লিষ্ট পশুর স্বভাব ধারণ করতে থাকে। পর জন্মে সে উক্ত পশুতে জন্মধারণ করে। ক্রমে-ক্রমে পুনঃজন্মক্রমে অন্য পশুতে দেহান্তর হয়।

অন্তরা-১ ঃ এ বাক্যগুলোতে গুরু রমিজ বলছেনগু অসৎ কর্ম হতে মুক্তি পেয়ে কর্ম মুক্তির জন্যই মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে এসেছে। কিন্তু তা না করে অবিরত পশু হত্যা করতঃ বীরত্ব ও অহমিকা প্রকাশ করে মানুষ দিন কাটাচ্ছে। ডাকাত যেমন বীরত্ব দেখিয়ে জোর পূর্বক মানুষের সর্বস্ব ও জীবন পর্যন্ত কেড়ে নেয়, তেমনি মানুষ হয়ে নির্বাক পশুগুলোকে উদরপূর্ণ করার নিমিত্তে সর্বদা পশু হত্যা করছে। রমিজ বলেছেন এ হত্যাকর্ম দেখে শুনে ডাকাতি করার সামিল।

অন্তরা-২ ঃ গুরু রমিজ তাঁর বাণীর দ্বিতীয় অন্তরার বাক্যগুলোতে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনগু চৌরাশি লক্ষ প্রকার জীবের জীবনচক্র কাটিয়ে এবার মানব জন্ম লাভ করা হয়েছে। তাই, তিনি জীবনচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করার উপায় তালাশ করার জন্য মানব জাতিকে আহ্বান করছেন।

অন্তরা-৩ ঃ অতঃপর তিনি বলছেনগু কর্ম দিয়েই মানুষ কর্মরোধ বা কর্ম মুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ সৎকর্ম দিয়ে অসৎ কর্মরোধ করা যায়। মানব তার আত্মবোধের মাধ্যমে পরম আত্মার সন্ধান লাভ করতে পারে। সদ্‌গুরু সঙ্গ করতঃ *আত্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জিত হলেই আত্মরোধ সৃষ্টি হয়* এবং পরম সত্যের সন্ধ্যান পাওয়া যায়। আর সে সত্য দৈববাণী, এলহাম, অহী, স্বপ্ন ইত্যাদি যোগে অনুভব করা যায় এবং অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখাও যায়। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং দিব্যজ্ঞান দ্বারা দিব্যচক্ষু (অন্তরচক্ষু) খুলে যায়। আর দিব্য চক্ষু বা অন্তর চক্ষু দ্বারা সকল সত্যকেই দেখা যায়। তখনই মানুষের নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ হয়। এ অবস্থায় মানুষকে আর জন্ম চক্রের আওতায় যেতে হয় না। মানব আত্মা এ অবস্থায় জন্মচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে বলা হয়।

অন্তরা-৪ ঃ এখানে বাক্যগুলোতে মহাগুরু রমিজ উক্ত অবস্থামতে বলছেন- সত্যকে উপলব্ধি করতঃ দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ম দিয়া কর্ম রোধ করা যায়। সদ্‌গুরুর আদেশ অনুযায়ী সকল সৎকর্ম সম্পাদন করতঃ অসৎ কর্ম রোধ করা যায়।

মহাগুরু রমিজ তাঁর পন্থীদেরকে প্রবোধ বা শান্তনা দিচ্ছেন যে, কর্ম দিয়া জন্মরোধ করা যায়। আর আত্মবোধ, দিব্য জ্ঞান, দিব্য চক্ষু ও আধ্যাত্মিক দর্শন অর্জন করতঃ নিজের মধ্যে খোদেখোদকে অর্থাৎ নিজের মধ্যেই স্রষ্টাকে অতীন্দ্রিয় (দিব্য চক্ষু) দ্বারা দেখা যায়।

আর সসীম মানবের পরম আত্মা তখন অসীম স্রষ্টার পরম আত্মার সাথে একাকার হয়ে বিলীন বা লয় হয়ে যায়। এ পরম মানবাত্মা আর ধরায় জন্ম নিতে হবে না। অর্থাৎ তাঁর জন্ম মৃত্যু রোধ বা রহিত (বন্ধ বা নিবৃত্ত) হয়ে গেল। তাই যেহেতু তাঁর (পরমাত্মার) আর জন্ম মৃত্যু নেই, সেহেতু তাঁর কাছে আর মৃত্যু দূত বা যম আসার প্রয়োজন নেই। এ যম-দূতের কাচারী বা কার্যালয়ও তাঁর পরমাত্মার জয় করা হয়ে গেল।

বাণী নং-১৬ ***"মিছে কেন ডাকাডাকি***
কে দেখল তাঁরে নিরাকারে
দেখলে তুমি আন সাক্ষী"।

১। মনরে যার যে কর্মে হল আকার, পশু পাখি নর যত প্রকার,
প্রাণী ছাড়া কোথায় জাগা তাঁর, বিচার কর খুলি জ্ঞানের আঁখি।

২। মনরে তুমি বল সে আছে নিরাকার, যদি থাকে কিন্তু প্রাণ আছে তাঁর
প্রাণ থাকিলে আছে তাঁর আকার, নিরাকারে অর্থ কিছু নাই ফাঁকি।

৩। মনরে প্রাণী ছাড়া যদি থাকত অন্যস্থানে, পেয়েছে বলি শুনতাম কানে,
সব শাস্ত্রে কয় সে সর্ব স্থানে, তাঁরে ছাড়া কিছু নাইরে বাকী।

৪। মনরে রমিজ কয় আমি দেখছি নিরাকার, আমার মত নাই একই প্রকার
যেমনি কর্ম তেমনি আকার, ফল ভোগে তার জীবে থাকি।

(স্থায়ী)ঃ *"মিছে কেন ডাকাডাকি*
কে দেখল তারে নিরাকারে
দেখলে তুমি আন সাক্ষী।"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার আকার এবং নিরাকার নিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কর্মবাদ এবং কর্ম অনুযায়ী আত্মার আকার প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তিনি বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়েছেন। গুরু রমিজ প্রথমেই বলেছেন স্রষ্টাকে যিনি নিরাকার অবস্থায় দেখেছেন তিন যেন তা বাস্তবে প্রামণ করে দেখিয়ে দেন এবং তার সাক্ষী দ্বারাও যেন প্রমাণ করা হয়। তিনি আরো বলছেন যে, স্রষ্টাকে নিরাকার অবস্থায় না দেখে মিছামিছি ভাবে ডাকাডাকি অর্থহীন।

১। অন্তরা ঃ *মনরে যার যে কর্মে হল আকার, পশু পাখি নর যত প্রকার,*
প্রাণী ছাড়া কোথায় জাগা তাঁর, বিচার কর খুলি জ্ঞানের আঁখি।

এ বাক্যগুলোতে মহাগুরু রমিজ বলছেন যে, জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় প্রাণী ছাড়া স্রষ্টার অবস্থান করার আর কোন স্থান নেই। যারা আত্মতত্ত্ব জানেন তাঁদের অন্তরচক্ষু (দিব্যচক্ষু) খোলা থাকে। সেই চক্ষু দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পশু-পাখি, প্রাণী, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, যতজীব বা সর্বজীব প্রত্যেকটিই জন্মান্তরবাদ অনুসারে পূর্ব জন্মে মানবাকারে ছিল। যে যেই আকারই থাকুক না কেন সকল জীব বা প্রাণীর মূল আত্মা হলো "মানবআত্মা"। মানবাকার ধারণ করে নিজ নিজ পূর্ব কর্ম দ্বারা পশু ও প্রাণীর স্বভাব অর্জন করতঃ পরবর্তী জন্মে যার যার অর্জিত স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণী বা জীবের আকার প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষও রয়েছে। যেমন-কানা, খোরা, লেংড়া, বধির ইত্যাদি। সকলেই (সর্বজীব) এক মানব জাতি হতে পূর্ব কর্মফলে বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন শ্রেণীতে, বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পশু ও প্রাণীতে জন্ম নিয়ে এসেছে। সকলের (সর্বজীবের) মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান।

২। অন্তরা ঃ

মনরে তুমি বল সে আছে নিরাকার, যদি থাকে কিন্তু প্রাণ আছে তাঁর
প্রাণ থাকিলে আছে তাঁর আকার, নিরাকার অর্থ কিছু নাই ফাঁকি।

এ অনুচ্ছেদে গুরু রমিজ বলছেন স্রষ্টা নিরাকার অবস্থায় আছেন এমন কথা যদি কেহ বলেন, আর যদি তাঁর (স্রষ্টার) সত্বার অবস্থান থাকে তবে তাঁর অবশ্যই প্রাণ আছে। আবার প্রাণ থাকলে তাঁর (স্রষ্টার) আহার বিহার সবই আছে এবং তাহলে তাঁর আকারও আছে। সুতরাং নিরাকার অর্থ কিছুই নাই এবং ইহা একটি ফাঁকি বা ধাপ্পা (Eye wash) মাত্র।

৩। অন্তরা ঃ

মনরে প্রাণী ছাড়া যদি থাকত অন্য স্থানে, পেয়েছে বলি শুনতাম কানে
সব শাস্ত্রে কয় সে সর্ব স্থানে, তাঁরে ছাড়া কিছু নাইরে বাকী।

এ বাক্যগুলোতে গুরু রমিজ বলেছেন যে, প্রাণী ছাড়া স্রষ্টা অন্য কোন স্থানে বাস করলে অবশ্যই কোন না কোন লোক তাঁর দেখা পেতেন এবং তা শুনাশুনি ও জানাজানি হয়ে যেত। ইহা মানব সমাজে বা লোকালয়ে প্রচারিত হয়ে যেত। তবে পৃথিবীর সকল শাস্ত্র স্রষ্টার একটি বিষয়ে একমত এবং সর্বশাস্ত্র সম্মত সত্য যে, তিনি (স্রষ্টা) সর্বত্র ব্যপ্ত ও বিরাজামন। এমন কোন স্থান বাকী নেই যে, সেখানে স্রষ্টার ব্যপ্তি নেই।

৪। অন্তরা ঃ সর্বশেষে গুরু রমিজ বাণীটির সঞ্চারীতে যা বলেন তা হলো-

মনরে রমিজ কয় আমি দেখছি নিরাকার, আমার মত নাই একই প্রকার,
যেমনি কর্ম তেমনি আকার, ফল ভোগে তার জীবে থাকি।

এখানে তিনি একথাই বুঝাচ্ছেন যে, তাঁকে (গুরু রমিজ) ছাড়া এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় অপর আর একজন লোকও নেই যার চেহারা, বর্ণ, কণ্ঠস্বর, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে তাঁর সাথে হুবহু মিল রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মত এরকম হুবহু সর্ব বিষয়ে সর্বতোভাবে মিল আছে এমন আর একজন রমিজ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর নেই। তাঁর উদাহরণ কেবল তিনি নিজেই। তিনি বেমিছাল।

তদ্রুপ প্রত্যেকটি প্রাণী ও জীব বেমিছালভাবে এ মহাবিশ্বব্রহ্মান্ডে বিচরণ করছে। *এ দৃষ্টান্ত বিহীন বেমিছাল রূপই হচ্ছে নিরাকার।*

একটির আকারের ন্যায় আরেকটি হুবহু আকার বিশিষ্ট প্রাণী বা জীব আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টান্ত (প্রাণী বা জীব) সে নিজেই।

সুতরাং, এ অবস্থায় এবং স্রষ্টার এ ব্যবস্থাপনায় তিনি বেমিছালভাবে সর্বজীবে আকার হয়েও নিরাকার রূপে সর্বত্র, সর্বভূতে, সর্বভূমে, সর্বক্ষণ বিরাজিত।

মানুষ যার যার পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী আকার ধারণ করতঃ সর্বজীবে জন্মান্তরিত হয়ে কর্মফল ভূগতেছে।

বাণী নং-১৭ *"সন্ধ্যা হলে ঠেকবি যাইয়া গুদারায়*
দিন থাকিতে চল পথে
দেখনা বেলা ডুবে যায়"।

১। মনরে গুদারা ঘাটের মাঝি, স্বভাব তাঁর বড় পাঁজি,
কার কথায় হয় না রাজি, চালায় তরী তাঁর ইচ্ছায়,
ডাকলে তাঁরে চায় না ফিরে, স্বভাব বুঝা মহাদায়।

২। মনরে যারে মাঝি দয়া করে, পয়সা ছাড়া পার করে,
আর কত জনায় পরে ফেরে, শোনেনা ধরিলে পায়,
ইচ্ছা হলে নিয়ে যায় কুলে, যারা চলে তাঁর ইচ্ছায়।

৩। মনরে মন মাঝির কথা ধর, তাঁর ইচ্ছা কি চিন্তা কর,
বিবেক দিয়া কর্ম সার, যেমনে বাধ্য করা যায়,
হইলে বাধ্য নাই কার সাধ্য, পার করিতে পয়সা চায়।

৪। মনরে রমিজ কয় তারে বাধ্য করা, হইতে পারলে জিতে মরা
আর হইলে সর্বহারা, যার কিছু নাই সব বিকি পায়,
তাহলে তারে নিবে পারে, পাওয়া দেনা সমান প্রায়।

<u>ব্যাখ্যা</u> ঃ (স্থায়ী) একটি দিনের মূল্যবান সময়কে চারটি ভাগে বিভাজন করা যায়। যেমন-
১। সকাল
২। দুপুর
৩। বিকাল
৪। সন্ধ্যা।

তদ্রুপ, একটি মানব জীবনের জীবন কালকেও নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভাজন করা যায়। যেমন-
১। শিশু বা শৈশবকাল
২। বাল্যকাল
৩। যৌবনকাল
৪। বৃদ্ধকাল।

উল্লেখ্য যে, রমিজের মতবাদে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে আধ্যাত্মিকভাবে মাত্র একদিন হিসেবে পরিগণিত হয়। মানুষের স্বাভাবিক চলার পথে সন্ধ্যা নেমে আসলে খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না। যারা চেতন লোক তাঁরা সন্ধ্যা নেমে আসার পূর্বে দিনের আলো থাকতেই যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তাতে সন্ধ্যা নেমে আসলেও দৈনন্দিন কাজের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। মানব জীবনেও বৃদ্ধকাল (সন্ধ্যা কালের ন্যায়) ঘনিয়ে আসলে তার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যায়। শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সারা জীবনের কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ করলে মনে হয় এই সেই দিন পৃথিবীতে এসেছি, আজ বৃদ্ধ হয়েছি। জীবন কি এতই অল্প সময়ের ! আহা, কিছুইতো করা হলো না। মনে একটা হাহাকার চলে আসে, সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো জীবন সন্ধ্যা নেমে আসে, সৃষ্টি হয় নৈরাশ্য ও বিফলতা (Frustration)।

এ অবস্থায় হৃদয় মনে হাহাকার, শোক বা আর্তনা বিজড়িত ব্যাপক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এ অন্তীম বয়সে স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ক বা আধ্যাত্মিক কোন কর্ম করার উপযুক্ত সময় আর হাতে থাকে না। জীবনে ভাল-মন্দ অনেক কর্ম করা হয়ে থাকে। সৎ কর্ম দ্বারা মন্দ কর্মের কর্ম-রোধ করার সুযোগ বৃদ্ধকালে আর থাকে না। কারণ, এ বয়সে মানুষের কোন প্রকার কর্মস্পৃহা থাকে না এবং কর্ম করার কোন ইচ্ছা শক্তিও থাকে না।

তাহলে, মন্দ কর্ম হতে পরিত্রাণ লাভ করার যথাযথ সময় হলো- বাল্যকাল হতে বৃদ্ধকালের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ বাল্যকাল হতে যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থা (প্রৌঢ়) পর্যন্ত। আধ্যাত্মিকভাবে এ সময়টা হলো মানব জীবনের মহা মূল্যবান সময় (golden time of life)।

মহাগুরু রমিজ তাই ভক্তদের বলেছেন-

"সন্ধ্যা হলে ঠেকবি যাইয়া গুদারায়
দিন থাকিতে চল পথে
দেখনা বেলা ডুবে যায়"।

এখানে মহাগুরু রমিজ পন্থীদেরকে/ভক্তদেরকে হুশিয়ার করে বলছেন-

"তোমাদের জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে প্রায়। নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক আত্মবোধ অর্জন করতঃ জীবত্ববোধ নাশ করে আত্মার পরমত্ববোধ সৃষ্টি করার এখনই (বাল্যকাল হতে প্রৌঢ় কাল পর্যন্ত) প্রকৃষ্ট সময়। ***সময় থাকতে তোমরা সদ্‌গুরুর চরণে অনুগত হয়ে তাঁর আদেশে সৎকর্ম কর। তবেই মুক্তি বা পরিত্রাণ পাবে"।***

সন্ধ্যায় যেমন মাঝি লোক নিয়ে অপর পাড়ে চলে যায় এবং চলে গেলে তখন হাজার ডাকলেও কাজে আসবেনা। তদ্রুপ সময় থাকতে সদ্‌গুরুর (মাঝির) সন্ধ্যান করে তাঁর মাধ্যমে আত্মকর্ম না করলে জীবনের শেষ লগ্নে এসে (রমিজ বর্ণিত সন্ধ্যাকালে) সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভ, তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া ও আত্মকর্ম সম্পাদন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। যেহেতু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, সেহেতু মহাগুরু রমিজ দিন থাকতে বা যথেষ্ট সময় থাকতে সদ্‌গুরু নির্দেশিত সৎ পথে, সৎ বিধানে, সৎ কর্ম করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

অন্তরা ১ ঃ এখানে গুদারা ঘাটের মাঝি বলতে সদ্‌গুরুকে বুঝায়। সদ্‌গুরু হচ্ছে- ইচ্ছা শক্তিধর একসত্তা যিনি মানব জীবনে মানুষকে পার্থিব জগতের ভবনদী পারাপার করে পার্থিব জগত হতে পরিত্রাণ (মুক্তি) দিতে পারেন।

আর এ পরিত্রাণ হলো জীবন মুক্তি বা মোক্ষ লাভ বা নির্বাণ লাভ করা। ভবনদীতে জীবন নিয়ে মানবকুল বিচিত্র কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। ভবনদীর মাঝি হচ্ছেন "সদ্‌গুরু"। গুদারা ঘাট হচ্ছে সদ্‌গুরুর আস্তানা অথবা বারামখানা। গুদারা মানে খেয়া নৌকা। তাহলে মহাগুরু রমিজ বর্ণিত গুদারা বলতে ইচ্ছা শক্তিময় সদ্‌গুরু ও তার বিধান সম্পৃক্ত শক্তিকে বুঝায়, যা মানবকে সৎকর্মের মাধ্যমে পার্থিব জগত হতে পার করে বা উত্তরণ (জীবন মুক্ত) করে পৃথিবীতে আসা যাওয়া বন্ধ করতঃ মানব আত্মার পরিত্রাণ দিতে পারে।

পরিত্রাণকৃত এ মানবাত্মা আর জন্ম-চক্রের আওতাভুক্ত থাকে না।

মহাগুরু রমিজ মতে উক্ত তরীর যাত্রী হলোগুসদ্‌গুরুর বিধানে আত্মসমর্পনকারী ভক্তবৃন্দ। সদ্‌গুরু আন্তর্যামী। তিনি সকলের অন্তরের বা হৃদয়ের কথা জানেন। কে কী কর্ম করেন তিনি তা তাঁর দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখেন।

তাই তিনি কর্ম ছাড়া কারো কথা শুনেন না। তাঁর ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর যাত্রী বা বিধানের ভক্ত পরিচালনা করে থাকেন। তিনি বিধান বহির্ভুত কারো কথা শুনেন না। তিনি কেবল একমাত্র বিধানের বা আইনের কথার মধ্যে পূর্বাপর স্থির থাকেন। তার আদেশের কোন পরিবর্তন বা বিচ্যুতি হয় না। তাই তাঁকে (গুদারা ঘাটের মাঝিকে) পাঁজি বা ঠেটা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাঁর বিধান মতে কর্ম ছাড়া শুধু ডাকাডাকি করলে তিনি কারো দিকেই ফিরে চাবেন না ইহাই তাঁর স্বভাব।

যারা আত্মতত্ত্ব না বুঝে তাঁকে ডাকাডাকি করে, সে অর্থহীন ডাকের কোন উত্তর বা সাড়া তিনি (মাঝি রূপ সদ্‌গুরু) দেননা। তাই তারা "তাঁর (মাঝির) স্বভাবের ধারা বুঝেনা ও জানেনা বলে তাঁর স্বভাব বুঝা মহাদায়" এ কথাটি উল্লেখ করেছেন।

মাঝির বিধান মানে তাঁর মতবাদ বা আত্মতত্ত্বের কর্মপথ। এ তত্ত্বের কর্ম পথ অনুস্মরণ করে চলাই তাঁর স্বভাব। যারা এ তত্ত্ব বুঝেনা তাদের জন্য মাঝির স্বভাব বুঝা বড়ই কঠিন বিষয়।

অন্তরা ২ ঃ এ বাক্যগুলোর প্রথমেই মহাগুরুর রমিজ বলেন-

"যারে মাঝি দয়া করে,
পয়সা ছাড়া পার করে"

তার মানে, যারা দয়া পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাদেরকে কোন বিনিময় ছাড়াই ভবনদী পার করা (মুক্তি দেয়া) হয়। ভবনদী পার করা হচ্ছে- মানবকে জন্মচক্রের (৮৪ লক্ষ প্রকার জীবের) বন্ধী দশা

হতে পরিত্রাণ লাভের উপায় করে দেয়া। কখন উক্ত দয়া পাবার যোগ্যতা অর্জন করা হয়েছে তা মাঝি বা সৎগুরুই জানেন। তবে, যোগ্যতা অর্জিত ভক্তগণও অতীন্দ্রিয় সাধনার মাধ্যমে এ বিষয়টি জানতে পারেন। আর যারা পূর্ব কর্মের ফেরে অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কর্মের ভাল-মন্দ বিবেচনায় অযোগ্য হয়েছেন তারা বহু ডাকাডাকি এবং আকুতি মিনতি করলেও তাদেরকে পারাপারের নৌকায় নেয়া হবে না। অর্থাৎ সদ্‌গুরু তাদেরকে গ্রহণ করবেন না এবং জন্মচক্রের বন্দী দশা হতে তারা পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভের পথ পাবেন না।

তবে যারা সদ্‌গুরুর (মাঝির) ইচ্ছায় ইচ্ছিত হয়ে আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত অবিরাম কর্ম করেছেন তাদেরকে নিজ ইচ্ছায় পার করে দেয়া হয়। অর্থাৎ যিনি গুরুর ইচ্ছায় চলবেন তাঁকে গুরু নিজ ইচ্ছায় পার করবেন।

অন্তরা ৩ ঃ যিনি মাঝির (সদ্‌গুরু) মনের ইচ্ছাধীন চলে সে মাঝিকে মন-মাঝি বলা হয়।

মহাগুরু রমিজ বলেছেন-

"মন মাঝির কথা ধর, তাঁর ইচ্ছা কি চিন্তা কর
বিবেক দিয়া কর্ম সার, যেমনে বাধ্য করা যায়,
হইলে বাধ্য নাই কার সাধ্য, পার করিতে পঁয়সা চায়"।

এখানে মন মাঝির কথা ধরতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মন মাঝির (সদ্‌গুরুর) আদেশ অনুযায়ী কর্ম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অত্র বাক্যগুলোতে বলা হয়েছে যে, কর্ম করার নিমিত্তে তাঁর (মন মাঝির বা সদ্‌গুরুর) কি ইচ্ছা আছে তা চিন্তা করতঃ বিবেক দ্বারা সঠিক কর্ম নির্ণয় করে তা সম্পাদন করতে হবে।

মহাগুরু রমিজ ভক্তদের আরো উপদেশ দিচ্ছেন যে, যে কর্ম করলে সদ্‌গুরুকে বাধ্য করা যায় জ্ঞানের বিচারক বিবেক দ্বারা সে কর্ম নির্ণয় পূর্বক তাই সম্পাদন করতে হবে। সদ্‌গুরুকে বাধ্য করতঃ তাঁর

ইচ্ছায় কর্ম করলে পার করার (পরিত্রাণের/মুক্তির জন্য) আর কোন বিনিময় চাওয়ার কেহই থাকবে না।

অন্তরা ৪ ঃ এ বাক্যগুলোতে মহাগুরু রমিজ বলেন-

"রমিজ কয় তারে বাধ্য করা, হইতে পারলে জিতে মরা,
আরো হইলে সর্বহারা, যার কিছু নাই সব বিকি পায়"

এ বাক্যগুলির মাধ্যমে মহাগুরু রমিজ তাঁর পরম ভক্তদের পরিত্রাণ ও মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী এবং বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। আর তা হলো- মন মাঝিকে (সদ্‌গুরুকে) বাধ্য করা যার একমাত্র পথ বা উপায় হলো তাঁর কাছে, তাঁর পদে বা বিধানে সর্বস্ব অর্পণ বা আমিত্বকে বিসর্জন দেয়া ও জিতে মরা হওয়া। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি যেমন কোন কিছুর প্রতিবাদ করতে পারে না, কিছু দেখে না, কিছু বলে না, তদ্রুপ জীবিত থেকেও কোন কিছুর প্রতিবাদ, আপত্তি ইত্যাদি করতে পারবে না। দেখেও দেখছে বলে বলতে পারবে না। আরো গভীরে আলোচনা করলে বুঝা যায় যে, ইহার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সুনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ ইহাদের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করতে হবে। আর তা হলেই সদ্‌গুরু ভক্তের বাধ্যগত হয়ে তাঁকে (পরমভক্তকে) পার বা পরিত্রাণ করবে। উল্লেখ্য যে, ভক্ত যত কর্মই করুক না কেন গুরুর পাওনা ও ভক্তের দেনা অর্থাৎ উভয়ের কর্ম ও কর্মফলের দেনা পাওনা পরিপূর্ণভাবে সর্বতোভাবে সমান হয় না। ভক্ত কর্ম সম্পাদন করবে বিনিময়ে গুরু তার কর্মফল প্রদান করবে। এ পর্যায়ে গুরু রমিজ বলেন পাওনা দেনা সমান প্রায়। সদ্‌গুরুর প্রাপ্য ও পরম ভক্তের দেনা প্রায় সমান সমান হবে, কিন্তু পুরোপুরি সমান হবে না। ভক্তের কর্মের সামান্য কিছু অপুরণীয় থাকলেও সদ্‌গুরু বিশেষ বিবেচনায় ভক্তের আজীবন ভক্তি ও বিশ্বাসের নিমিত্তে তাকে কৃপা করতঃ তাঁর কর্মের ফলাফল সমান সমান করতঃ তাকে মুক্তি বা পরিত্রাণ করে দেন।

বাণী নং-১৮ *"চিন্তা কর চিন্তামণি সে কোথায়*
আরশ কুরছি লহু মাফুজে
লেখতে আছে সর্বদায়"।

১. *মনরে বসিয়া আরশ কুরছিতে, রহমতের কলম নিয়া হাতে,*
লেখতে আছে আপন জাতে, যখন যা তাঁর ইচ্ছা হয়,
যদি লেখে ভুলে হারা হয় মূলে, সাধের ভরা ডুবে যায়।

২. *মনরে কলমের কালির কি কৌশল, শত রঙ্গের হয় ফল,*
তাতে আছে আজব কল, বন্ধ হয়না লেখছে প্রায়,
লেখে জীবে কেউ না বুঝে, লেখতে লেখতে আয়ু ক্ষয়।

৩. *মনরে যে হয়েছে কলমদার, তাঁর কাছে সর্বভার,*
সে করে কলমের কারবার, লেখতে আছে সর্বদায়,
আসল বাকী সে করে লেখালেখি, ষোল আনা তার মিল সদায়।

৪. *মনরে রমিজার ঐ ষোলআনা, যোগ দিলে যোগে মিলেনা,*
সদায় আমার এই ভাবনা, আসল বাকীর কি উপায়,
যদি হয় বিবেচনা, মিলাবে ষোলআনা,
আমার সব বিকি দিয়াছি পায়।

স্থায়ী ঃ *"চিন্তা কর চিন্তামণি সে কোথায়*
আরশ কুরছি লহু মাফুজে
লেখতে আছে সর্বদায়" ।

ব্যাখ্যাঃ যিনি গভীর চিন্তা, ধ্যান বা মোরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টার দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য (রহস্য) উদ্‌ঘাটন করতে পারেন তিনিই একজন চিন্তামণি। সৃষ্টির বিষয়াদি নিয়ে যে পবিত্র স্থানে ও আত্মিক উচ্চতম স্তরে (আরশ) অবস্থান করতঃ স্রষ্টা তাঁর আসনে (কুরছি) বসে সর্ব সৃষ্টির তদারক করেন তা হচ্ছে আরশ কুরছি (আলমে আরওয়ায় অবস্থিত)।

উক্ত বাণীর অংশে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে (মোরাকাবা) করতঃ আধ্যাত্মিক তথ্য নিরুপণ করার জন্য আধ্যাত্মিক বিষয় সংশ্লিষ্ট মহান ব্যক্তিগণকে আহ্‌বান করছেন। একই সাথে সেখানে (আলমে আরওয়ায়) বা আত্মার রাজ্যে সর্বজীবের সকল কর্মকান্ড ও সর্ব সৃষ্টির তথ্য সর্বদা লিখে রেখে রেকর্ড করতঃ সংরক্ষণাগারে (লহু মাফুজে) রাখার ঘটনার কথাও বলা হয়েছে। এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য গুরু রমিজ বাণীর প্রথম অংশেই তাঁর চিন্তামণি ভক্তদের আহ্‌বান করছেন।

অন্তরা ১ ঃ *মনরে বসিয়া আরশ কুরছিতে, রহমতের কলম নিয়া হাতে,*
লেখতে আছে আপন জাতে, যখন যা তাঁর ইচ্ছা হয়,
যদি লেখে ভুলে হারা হয় মূলে, সাধের ভরা ডুবে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মহাগুরু রমিজ ইহাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানব দেহের অত্যন্ত উচ্চতম স্তর হচ্ছে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল ও আত্মসমর্পণকারী মানবের পবিত্র হৃদয় (আরশ)। মারেফাত জগতের সূফী সাধকবৃন্দের মতানুযায়ী এ হৃদয়ই হচ্ছে স্রষ্টার আরশ। আর কলম হচ্ছে স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তি। স্রষ্টার রহমতের কলম বলতে তাঁর কৃপা বা দয়ারূপ ইচ্ছাশক্তিকে বুঝায়।

স্রষ্টা সর্বোত্তম বিচারক। যারা উত্তম কর্ম করেন তিনি (স্রষ্টা) তাঁদেরকে কর্ম অনুযায়ী উত্তম ফল দান করেন, ইহা কর্মবাদের মূল নীতি বা বিধান।

আবার যেহেতু, রহমত হচ্ছে দয়া, কৃপা বা অনুগ্রহ। তাই রহমতের কলম মানে যে শক্তির মাধ্যমে স্রষ্টা মানবকুল তথা সৃষ্টির সর্ব জীবকে তাদের অসহায় অবস্থায় দয়া বা কৃপা করে থাকেন।

এমন কিছু বিষয় আছে যার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কর্ম করেও তার ফল অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পরে। কেবলমাত্র মানবের অনুতাপের জন্য-ই স্রষ্টা রাহ্‌মানির রাহিম বা পরম করুণাময় দয়াল ও দাতা হিসেবে মানবকে সমূহ বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন। "এই পরম করুণাময় শক্তিই হচ্ছে স্রষ্টার রহমতের কলম"।

গুরু রমিজ তাও বলেছেন যে, মানব ও সর্বজীব পরম আত্মা (স্রষ্টা) হতে সৃষ্ট। তাই, সকল-ই তাঁর জাত। আবার লেখা-লেখি হচ্ছে স্রষ্টার নিজ ইচ্ছা ক্ষমতা দ্বারা, যে যেই কর্মকান্ডে লিপ্ত তা সাথে সাথেই লিখে রেখে তাঁর বিধান মতে সংরক্ষণাগারে (জ্ঞান ভান্ডারের স্মৃতিফলকে) স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা। এই জ্ঞান ভান্ডারের স্মৃতিফলক নিয়েই আত্মা সমুহ মৃত্যুর পর আলমে আরওয়ায় চলে যায়। এখানে (বাণীতে) তা-ও উল্লেখ আছে যে, যদি কেহ ভুল লেখা-লেখি বা স্রষ্টার বিধান বিরোধী কোন কর্মকান্ডে (ষড়রিপু, এগারো ধারার পাপ ও ইন্দ্রিয়াদি তাড়িত কর্ম) জড়িত থাকে তবে তার ভরা বা বোঝাই নৌকা অর্থাৎ অসৎ কর্মে ভরপুর দেহ, কর্ম ফেরে মানব দেহ ছেড়ে পশু দেহে দেহান্তরিত হবে। কারণ, অনেক স্বাদ করে পাপাচারে আসক্তির ফলগুই এরকম হয়।

অন্তরা ২ ঃ *মনরে কলমের কালির কি কৌশল, শত রঙ্গের হয় ফল,*
তাতে আছে আজব কল, বন্ধ হয়না লেখছে প্রায়,
লেখে জীবে কেউ না বুঝে, লেখতে লেখতে আয়ু ক্ষয় ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কলম বলতে স্রষ্টার শক্তি এবং কালি বলতে স্রষ্টার অনন্ত শক্তির উৎসকে বুঝায় । এই অনন্ত শক্তির রূপও অনন্ত । মানুষ স্রষ্টার জাত হিসেবে কর্ম অনুযায়ী অদ্ভূত, আশ্চর্য বা অসাধারণ কল, মেশিন বা যন্ত্রের মত অনন্তরূপী জীবে বিচরণ করছে । স্রষ্টার এই কৌশল বা আশ্চার্য ব্যবস্থা অনাদি-অনন্তকালের জন্য চালু ছিল, আছে এবং থাকবে । প্রত্যেকটি মানব বা জীব অসাধারণভাবে আজব (আশ্চর্য) কর্মে মগ্ন আছে । একটির কর্ম-কৌশল অপরটিতে কোনক্রমেই বুঝার নয় এবং এভাবেই তাদের জীবন (আয়ু) অবসান ঘটে ।

অন্তরা ৩ ঃ *মনরে যে হয়েছে কলমদার, তাঁর কাছে সর্বভার,*
সে করে কলমের কারবার, লেখতে আছে সর্বদায়,
আসল বাকী সে করে লেখালেখি, ষোল আনা তার মিল সদায় ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে গুরু রমিজ বলছেন যে, যিনি কলমদার বা উক্ত শক্তি অর্জন করেছেন তাঁর নিকট স্রষ্টার প্রতিনিধির সকল ভার বা ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । তিনি কলম বা শক্তির বেচা-কেনা অর্থাৎ বিনিময় করার ক্ষমতা প্রাপ্ত । স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে সে তাঁর ভক্তবৃন্দের সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম ফল দিতে পারেন । ইহাই গুরু (প্রতিনিধির) ও ভক্তের কর্ম ও কর্ম-ফলের বিনিময় বা বেচা-কেনা । যিনি উক্ত কলমদার (প্রতিনিধি বা সদ্‌গুরু) তিনি প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সকল ভক্তের কর্মকান্ডের হিসাব নিয়ে তাঁদের কর্মের ভার গ্রহণ করতঃ কর্মের খতিয়ান বা কৃত-কর্ম কতটুকু করা হলো আর কতটুকু বাকী রইল তা অবগত হয়ে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর্ম করানোর মাধ্যমে, আত্মার মুক্তির জন্য ষোল-আনা বা সর্ব কর্ম সমাধা করে দেন ।

অন্তরা ৪ ঃ *মনরে রমিজার ঐ ষোলআনা, যোগ দিলে যোগে মিলেনা,*
সদায় আমার এই ভাবনা, আসল বাকীর কি উপায়,
যদি হয় বিবেচনা, মিলাবে ষোলআনা,
আমার সব বিকি দিয়াছি পায় ।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ একজন ভক্তরূপ ধারণ করে বা ভক্তের ভূমিকায় গিয়ে, ভক্তের আবেগ বা ভাবাবেগের কথা বর্ণনা করছেন । এ অবস্থায় তিনি বলেছেন, তাঁর উক্ত ষোলআনা অর্থাৎ সর্বকর্ম হিসাব করলে সর্বদা-ই কর্মের কিছু বাকী থেকে যায় । একজন ভক্ত জীবনে গুরু প্রদত্ত সর্বকর্ম পুরাপুরি (সমগ্র) সম্পন্ন করতে পারেন না । অতিব সামান্য অবশিষ্ট কর্ম ষোলআনা মিল করার জন্য পরম ভক্ত উপায় খুঁজছেন । তাই, তিনি গুরুপদে আত্মসমর্পণ করতঃ ষোলআনা মিলানোর জন্য বাকী কর্মের ভার সদ্‌গুরুর দয়া বা কৃপার উপর ছেড়ে দিয়েছেন ।

(বিঃ দ্রঃ এ অবস্থায় সদ্‌গুরু ভক্তের আদি-অন্ত বিবেচনা করে কৃপাগুণে ভক্তের মনো-বাসনা পুরা করতঃ তাঁর আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা করে থাকেন) ।

উল্লেখ্য যে, কিছু সংখ্যক ওন্ড প্রকৃতির লোক ইচ্ছাকৃতভাবে এ মহা মূল্যবান বাণীর বিকৃত-ব্যখ্যা বা অপব্যখ্যা প্রদান করতঃ সাধারণ সরল প্রাণ ভক্তদেরকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এ ধরণের ওন্ড প্রকৃতির লোকদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো।

ইতি– গ্রন্থকার